POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتٰبِ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاَدْخَلْنٰهُمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ

এবং যদি আহলে কিতাব ঈমান আনিত এবং তাকওয়া অবলম্বন করিত তাহা হইলে অবশ্যই আমরা তাহাদের যাবতীয় দোষ তাহাদের নিকট হইতে দূরীভূত করিতাম এবং তাহাদিগকে বিবিধ নেয়ামতের জান্নাত সমূহে দাখিল করিতাম।

(আল মায়েদা: ৬৬)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْد
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 6

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫৭৫ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

সংখ্যা 31

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

5 আগস্ট, 2021 ● 25 যুল হাজ্জাহ 1442 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

যাকাত দেওয়ার শর্তে বয়আত।

১৪০১) হযরত জারীর বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে, 'আমি নবী (সা.) এর হাতে যত্নসহকারে নামায পড়ার, যাকাত প্রদানের এবং প্রত্যেক মুসলমানদের হিত কামনার শর্তে বয়আত করেছিলাম।'

যাকাত প্রদান থেকে বিরত ব্যক্তিদের পাপ।

১৪০২) হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.)-এর পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে নবী করীম (সা.) বলেছেন, (কিয়ামত দিবসে) উটগুলি তার মালিকের কাছে সুস্থ সবল অবস্থায় আসবে, যেমনটি তারা ছিল। মালিক যদি তাদের অধিকার সংক্রান্ত কোনও বিষয় না দিয়ে থাকে, তবে তারা মালিককে পদদলিত করবে আর ছাগলরাও তার কাছে আসবে ভাল অবস্থায় , যেমনটি তারা পূর্বে ছিল। সে যদি তাদের সম্পর্কিত কোন অধিকার না দিয়ে থাকে, তবে ছাগলগুলি খুর দিয়ে তাকে পদদলিত করবে এবং সিং দিয়ে গুঁতো মারবে। তিনি বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ যেন এমন অবস্থায় কিয়ামত দিবসে না এসে পৌছয়, যখন কিনা ছাগলকে সে কাঁধে তুলে রাখবে আর ছাগল চিৎকার করতে থাকবে। অতঃপর সে ডেকে বলবে, মহম্মদ! আমি বলব আমি তোমার জন্য কিছু করতে পারব না। আমি তো সত্যের বাণী ভালভাবে পৌঁছে দিয়েছিলাম। আর কেউ যেন উটকে নিজের কাঁধে করে বয়ে নিয়ে না আসে, যখন কি না সে বিড় বিড় করতে থাকে। আর সে বলে, মহম্মদ! আমি বলব, তোমার জন্য কিছু করতে পারব না। আমি তো (আল্লাহ্‌র বাণী) ভালভাবে পৌঁছে দিয়েছিলাম।

(সহী বুখারী, ৩য় খণ্ড)

এই সংখ্যায়

খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ২রা জুলাই ,২০২১ হুযুর আনোয়ার (আই.) সফর বৃত্তান্ত জার্মানী, ২০১৪ (জুন)

আমি আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে ঘোষণা করেছি যে, আল্লাহ্ আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করে পাঠিয়েছেন। কিন্তু যদি এদের মনে আল্লাহ্ তা'লার বিষয়ে কোন শ্রেষ্ঠত্ব থাকত, তবে অস্বীকার করত না। আর খোদার নামে উপহাসকারী হিসেবে গণ্য হওয়ার ভয়ে তারা গুটিয়ে যেত।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

পুণ্যকর্ম চেনার উপায়

এরা বোঝেই না- আমার মাঝে ইসলাম বিরুদ্ধ কি আছে? আমরা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পাঠ করি, নামাযও পড়ি, রমযানে রোযাও রাখি আর যাকাতও দিই। তবে আমি কেবল এতটুকুই ঘোষণা করেছি যে তাদের এই সব কাজগুলি সঠিক অর্থে পুণ্যকর্ম নয়, এগুলি খোলস মাত্র, যার মধ্যে কোনও অন্তঃসার নেই। অন্যথায় এগুলি যদি প্রকৃতই পুণ্যকর্ম হত তবে এর ইতিবাচক পরিণাম কেন প্রকাশ পায় না? এগুলি তখনই সঠিকঅর্থে পুণ্যকর্ম বলে বিবেচিত হবে, যখন তা যাবতীয় ত্রুটি ও সংমিশ্রন থেকে মুক্ত থাকবে। কিন্তু এদের মধ্যে এই সব গুণ কোথায়? আমি কোনভাবেই বিশ্বাস করতে পারি না যে একজন মোমেন মুত্তাকি এবং সৎকর্মশীল,অথচ সে একজন ধার্মিক ব্যক্তির শত্রুতা করবে। যদিও এরা আমাকে বিধর্মী তথা নাস্তিক নামে অভিহিত করে, কিন্তু এরা নিজেরা খোদাকে ভয় করে না। আমি আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে ঘোষণা করেছি যে, আল্লাহ্ আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করে পাঠিয়েছেন। কিন্তু যদি এদের মনে আল্লাহ্ তা'লার বিষয়ে কোন শ্রেষ্ঠত্ব থাকত, তবে অস্বীকার করত না। আর খোদার নামে উপহাসকারী হিসেবে গণ্য হওয়ার ভয়ে তারা গুটিয়ে যেত। কিন্তু এটা তখন হয় যখন তাদের মধ্যে আল্লাহ্‌র উপর প্রকৃত ঈমান থাকে আর তারা পরকালের শাস্তি সম্পর্কে ভয় করে আর لَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ আয়াতের শিক্ষাকে তারা শিরোধার্য করে। (বনী ইসরাঈল: ৩৭)

আউলিয়াদেরকে অস্বীকার করা ঈমান হানির কারণ হয়।

তাদের চিন্তাধারা এবং ঈমানী শক্তি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে তারা নবীর অস্বীকারকারীকে কাফের নামে অভিহিত করে, কিন্তু আউলিয়াকে অস্বীকার করা 'কুফর', এমনটি আবশ্যক নয়। তারা মনে করে, এক ব্যক্তিকে অস্বীকার করলে এমন কি আসে যায়? এরা আউলিয়া আল্লাহকে অস্বীকার করা সামান্য বিষয় মনে করে আর প্রশ্ন করে এতে কিসের ক্ষতি হবে? কিন্তু বস্তুত, আউলিয়াদেরকে অস্বীকার করা ঈমান হানির কারণ হয়। যে ব্যক্তি এই বিষয়টির প্রতি অভিনিবেশ সহকারে দৃষ্টি দিবে, সে পরিস্কার দেখতে পাবে, যেমনভাবে আয়নায় নিজের চেহারা দেখতে পায়।

স্মরণ রাখা উচিত যে ঈমান হানি দুই ভাবে হয়। প্রথমত, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম কে অস্বীকার করলে- একথা তো সর্বজনী স্বীকৃত, কেউই তা অস্বীকার করতে পারবে না। দ্বিতীয়ত, আউলিয়া এবং আল্লহ্‌র প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তিদের অস্বীকার করার কারণে ঈমান হানি ঘটে।

আম্বিয়াদের অস্বীকারের ফলে ঈমান হানি হওয়া সম্পূর্ণ সুস্পষ্ট বিষয়, একথা সর্বজনবিদিত। কিন্তু তবু একথা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, আম্বিয়া আলাইহিমুস সালাম কে অস্বীকার করার কারণে ঈমান হানি এই জন্য হয় যে, নবী দাবি করে, তাঁরা খোদার পক্ষ থেকে এসেছেন আর খোদা তা'লা ঘোষণা করেন, 'যা কিছু এরা বলছেন সেগুলি আমার কথা। এ আমার প্রেরিত নবী, এর উপর ঈমান আন, আমার কিতাবকে মান্য কর, আর আমার বিধিনিষেধ শিরোধার্য কর।' যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'লার কিতাবের উপর ঈমান আনে না, তাঁর উপদেশাবলী এবং তাঁর নির্ধারিত সীমা মেনে চলে না, সেই ব্যক্তি এগুলিকে অস্বীকার করে কাফের হয়ে যায়। কিন্তু যে পরিস্থিতিতে আউলিয়া উল্লাহকে অস্বীকার করার কারণে ঈমান হানি হয় তা ভিন্ন। একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা বলেন- مَنْ عَادٰى لِيْ وَلِيًّا فَاٰذَنْتُهٗ لِلْحَرْبِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার বন্ধুর সাথে শত্রুতা করে, বস্তুত সে আমার সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হয়।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩১৩)

নুরুল ইসলাম বিভাগের অধীনে

আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে জানতে -

টোলফ্রী নম্বর: 1800 103 2131

প্রত্যহ 8:30 **am**-10:30**pm** পর্যন্ত। (শুক্রবার ছুটি)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০১৪ (জুন) সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর জার্মান সফর

১৬ জুন, ২০১৪

মেসেডোনিয়ান অতিথিদের সঙ্গে সাক্ষাত অনুষ্ঠানে প্রশ্নোত্তর পর্ব

প্রশ্ন: খলীফাতুল মসীহ কি জলসার যাবতীয় ব্যবস্থাপনা নিয়ে সন্তুষ্ট আর জলসায় অংশগ্রহণকারী অতিথিদের সংখ্যা কি আপনার প্রত্যাশা মত?

হুযুর আনোয়ার বলেন: উন্নতশীল জাতিগুলি ক্রমোন্নতির সন্ধানে থাকে। আমরা বলতে পারি না যে আমরা এমন পর্যায়ে পোঁছে গিয়েছি যেখানে সব কির্ছু অর্জিত হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি জলসার ব্যবস্থাপকদের নির্দেশ দিয়ে রেখেছি, তারা যেন একটি রেড বুক তৈরী করে, আর জলসার ব্যবস্থাপনায় যে সব ত্রুটি বিচ্যুতি থেকে যায় সেগুলি এর মধ্যে লিখে রাখে। যাতে পরের বছর সেই সব দুর্বলতাগুলি দুরা করা যায়, সেগুলির পুনরাবৃত্তি না ঘটে। কালকেই বিদ্যুৎ সরবরাহ বিভাগে গণ্ডগোল দেখা দেয়, যার ফলে শব্দ ঠিকমত পোঁছচ্ছিল না। তাই আমি কিভাবে বলতে পারি যে ব্যবস্থাপনা নিয়ে স্বস্তিতে আছি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: অনেক সময় মহিলাদের পক্ষ থেকে বাচ্চাদের সুযোগ সুবিধার কিছুটা খামতি থাকে, যার অভিযোগ আসে। আমাকে অনেকেই চিঠি লিখে জানায়। জলসা এখন শেষ হয়েছে, তাই যে যে ক্ষেত্রে খামতি ছিল, সেগুলির বিষয়ে একে একে সংবাদ পেতে থাকব।

আগামী বছর এই ত্রুটি গুলি দূর করব। ইনশাআল্লাহ। আর যতদূর জলসায় আগত অতিথিদের সম্পর্ক, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এখানকার অধিকাংশই, প্রায় ৯০-৯৫% মানুষ অংশগ্রহণ করেছে। বেশ সুন্দর পরিবেশ ছিল। অংশগ্রহণকারী অতিথিদের সংখ্যা সন্তোষজনক ছিল। যাইহোক আরও উন্নতির অবকাশ আছে। কেননা প্রতি বছর সংখ্যা বৃদ্ধি পায় আর চাহিদাও বৃদ্ধি পায়। তাই আরও উন্নতি করা প্রয়োজন থেকেই যায়।

প্রশ্ন: খৃষ্টানরা যদি ইসলাম গ্রহণ না করে তবে তাদের প্রতি কিরূপ আচরণ করা হবে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আল্লাহ্ তা'লা বলেন, ধর্ম মানুষের অন্তরের বিষয়। মানুষের উদ্দেশ্যর উপর নির্ভর করে তার ক্রিয়াকলাপ। খোদা কার সঙ্গে কিরূপ আচরণ করবেন, তা তিনিই উত্তম জানে। যদি কেউ নামসর্বস্ব মুসলমান হয়, আর অপকর্ম করে বেড়ায়, অপরদিকে রয়েছে একজন উন্নত নৈতিক চরিত্রের খৃষ্টান- এক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা'লা তাকে ক্ষমা করার অধিকার রাখেন। খোদা তা'লা কুরআন করীমে স্পষ্টভাবে বলেছেন-'লা-ইকরাহা ফিদ্দীন- কাত্তাবাইয়ানার রুশদু মিনাল গাই'। অর্থাৎ ধর্মের বিষয়ে কোন বলপ্রয়োগ নেই। নিঃসন্দেহে হেদায়াত পথভ্রষ্টতা থেকে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান। (বাকারা: ২৫৮)

হুযুর আনোয়ার বলেন: ইসলামের শিক্ষাই হল প্রকৃত সত্য যা সর্বোতভাবে পরিপূর্ণ। তাছাড়া খোদা তা'লা যেভাবে চান, বিচার করতে পারেন, যাকে খুশি ক্ষমা করতে পারেন, এবং শাস্তি দিতে পারেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ইসলামের শিক্ষা হল খোদা তা'লার অধিকার প্রদান করা এবং খোদার বান্দাদের অধিকার প্রদান করা, আর অতীতে বিভিন্ন জাতির মধ্যে যে সকল আম্বিয়া এসেছেন, তাদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা। অতীতের সকল নবী একজন শেষ নবীর আগমণের ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, যাঁর মাধ্যমে খোদা প্রদত্ত শিক্ষা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছিল। আমরা বিশ্বাস করি, আঁ হযরত (সা.)-এর আগমণে মাধ্যমে সেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়েছে আর তাঁর মাধ্যমে শরিয়ত বা ধর্মীয় বিধান পরিপূর্ণ হয়েছে। এখন একদিকে ইসলামের পরিপূর্ণ শিক্ষা রয়েছে, অথচ অপরদিকে এর বিপরীতে আমরা দেখতে পাই মুসলমানদের শোচনীয় অবস্থা। এটা কেন হয়েছে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: এই সম্পর্কে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে ইসলামের উপর এমন এক যুগ আসতে চলেছে যখন ইসলামের ধ্বজাধারীরা এর শিক্ষাকে ভুলে যাবে, তারা কেবল নামমাত্র মুসলমান হবে। মসজিদগুলি তাদের বাহ্যত নামাযি দ্বারা পরিপূর্ণ হলেও হিদায়তশূন্য হবে। কুরআনের শব্দাবলীল ছাড়া কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। তাদের উলেমারা আকাশের নীচে বসবাসকারী নিকৃষ্টতম জীব হবে। অর্থাৎ যাবতীয় মন্দের উৎস তারাই হবে। সেই সময় একজন সংস্কারকের আবির্ভাব ঘটবে, যিনি সকলকে একত্রিত করবেন, সকল ধর্মের মানুষকে সংঘবদ্ধ করবেন আর ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার প্রসার করবেন এবং সকলকে ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ করবেন। সুতরাং, আঁ হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভাব ঘটেছে, তিনি মসীহ ও মাহদী হয়ে এসেছেন। ১৮৮৯ সালে জামাতে আহমদীয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। আমরা আগমণকারী মসীহকে মান্য করেছি, আর অন্যান্য মুসলমানেরা তাঁকে মান্য করে নি। আহমদী ও অ-আহমদীদের মধ্যে এটিই মূল পার্থক্য।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ইসলামি শিক্ষার দৃষ্টান্ত আপনারা এখানে জলসায় নিশ্চয় দেখেছেন, ভালবাসা, শান্তি ও সৌহার্দ নিশ্চয় চোখে পড়েছে। আর সারসংক্ষেপ সেটিই- অর্থাৎ= শান্তি কিম্বা প্রতিদান দেওয়ার বিষয়টি খোদার হাতে। খোদা তা'লা এই পৃথিবীতে যাকে মসীহ ও মাহদী করে পাঠিয়েছেন, তাঁকে গ্রহণ করলে ইহকাল ও পরকালের পুরস্কার লাভ করবে। কাকে কতটা পুরস্কার দিতে হবে তা খোদা তা'লার বিষয়।

এক ভদ্রমহিলা প্রশ্ন করেন যে মৃত্যুর পর পরকালে ভিন ধর্মীদের সঙ্গে কিরূপ আচরণ হবে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: এর উত্তর আমি দিয়ে দিয়েছি। পরকালের জীবন হল শাশ্বত জীবন। পৃথিবীতে পুণ্যকর্ম করলে, খোদার অধিকার প্রদান করলে এবং তাঁর সৃষ্টির অধিকার প্রদান করলে আল্লাহ্ জান্নাতের উত্তরাধিকারী করবেন।

খোদা তা'লা কুরআন করীমে বলেন, যারা ইহুদী, নাসারা এবং সাবী রয়েছে, তাদের মধ্যে যারাই আল্লাহ্ এবং পরকালের উপর ঈমান এনেছে এবং পুণ্যকর্ম সম্পাদন করেছে, খোদা তা'লা তাকে প্রতিদানে দিবেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন: এক শেষ নবীর আগমণের ভবিষ্যদ্বাণী ছিল। তাঁকে মান করা আবশ্যক। তাঁকে মান্য করলে তবেই আল্লাহ্ তা'লার ঈমান পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আঁ হযরত (সা.)-এর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি বলল ' আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, অমুক ব্যক্তিকে আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন না। এমন কথায় আল্লাহ্ বললেন, 'আমি অমুক ব্যক্তিকে ক্ষমা করব না- এমন প্রতিবন্ধকতা আমার উপর কে আরোপ করতে পারে? আমি তাকে ক্ষমা করলাম। তবে সেই ব্যক্তির পুণ্যকর্ম বিনষ্ট হল যে এই কথা বলেছিল।

হুযুর আনোয়ার বলেন: কাজেই মানুষের উচিত পুণ্য কর্ম করা এবং পুণ্যকর্মে উন্নতি করা। খোদা তা'লার কৃপার ব্যপ্তি অনন্ত, প্রত্যেক বস্তুকে তা পরিবেষ্টন করে আছে।তিনি যাকে চান ক্ষমা করেন।

একজন অতিথি বলেন, 'আমি জন্মগত খৃষ্টান। এই প্রথম জলসায় এসেছি। আপনাদের সংগঠন দেখেছি।' তিনি প্রশ্ন করেন যে, সাবালকত্ব অর্জনের পর থেকে আমার মাথায় একটিই প্রশ্ন ঘুরপাক খায় যে, পৃথিবীতে এতবেশি ধর্ম রয়েছে- এগুলি কি সমন্বিত হয়ে এক অভিমুখে চলতে পারে না?

হুযুর আনোয়ার বলেন: সমগ্র জগতের মানুষকে এক হাতে একত্রিত করার এই মহান কাজের জন্যই তো জামাত আহমদীয়া প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যেন সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়, এক ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যে মসীহ মওউদ এসে সকলকে একত্রিত করবেন। জামাত আহমদীয়া এ নিয়েই তবলীগ করে থাকে। উত্তর এবং দক্ষিণ আমেরিকার দেশসমূহে, আফ্রিকার পূর্ব এবং পশ্চিমের দেশসমূহে, ইউরোপ এবং এশিয়ায়, সুদূর প্রাচ্যের দেশসমূহেও এবং দ্বীপসমূহেও তবলীগ করছে। মোটকথা পৃথিবীর সর্বত্র তবলীগ করছে এবং শান্তির বাণী প্রচার করছে।

জামাত আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ান নামক একটি ছোট্ট গ্রামে দাবি করেন যে খোদা তাঁকে আঁ হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে মসীহ ও মাহদী করে পাঠিয়েছেন। গ্রাম থেকে উত্থিত সেই আওয়াজ আজ আল্লাহ তা'লার কৃপায় পৃথিবীর ২০৪টি দেশে প্রসার লাভ করেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্ম এবং জাতির মানুষ জামাত আহমদীয়ায় প্রবেশ করছে।

আমাদের একান্ত বাসনা, সমগ্র জগতের মানুষ এক হাতে একত্রিত হোক, পৃথিবী এক ও অভিন্ন ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত হোক, এক-অদ্বিতীয় খোদার মান্যকারী হোক, যাতে সকলে শান্তিতে বসবাস করে।

একজন অতিথি প্রশ্ন করেন যে, বিভিন্ন ধর্মের নেতারা বসে আলোচনা করা এবং পরিকল্পনা করা কি সম্ভব?

হুযুর আনোয়ার বলেন: জামাত এর চেষ্টা করে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) রাণী ভিক্টোরিয়াকে এই মর্মে চিঠি লিখেছিলেন যে, 'আমরা সকলে এক খোদায় বিশ্বাসী, তবে সেই এক-অদ্বিতীয় খোদার নামে আমাদের সকলের এক হওয়া উচিত।'

হুযুর আনোয়ার বলেন: এ বছরই গিল্ড হলে একটি সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে খৃষ্টান, ইহুদী প্রতিনিধিবর্গ, দালাই লামার প্রতিনিধি এবং অন্যান্য ধর্মের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। সেখানে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম ও জাতির প্রায় এক হাজার মানুষের সমাবেশ ঘটেছিল। সেই সম্মেলনের বিষয়বস্তু ছিল-'একবিংশ শতাব্দীতে খোদার অবধারণা।'

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমি সেখানে ইসলামের প্রতিনিধি হিসেবে বক্তব্য রেখেছিলাম। কাজেই জামাত আহমদীয়া প্রথম থেকেই ধর্মীয় নেতাদের একত্রিত করার কাজ করে

(এরপর ৯ পাতায়..)

জুমআর খুতবা

বড়ই পরিতাপের বিষয়। আমি যদি নিজে (উটের) উপাদেয় অংশ খাই আর অন্যদেরকে মন্দ অংশ খাওয়াই, তবে আমি কতই না মন্দ তত্ত্বাবধায়ক সাব্যস্ত হব! এই মাংসের বাটি নিয়ে যাও আর অন্য কোন খাবার থাকলে সেটা আমার জন্য নিয়ে আস।

মহানবী (সা.)-এর এক নির্দেশনার ভিত্তিতে হযরত উমর (রা.) যখন ইহুদী এবং খ্রিস্টানদেরকে ইয়েমেন থেকে বহিষ্কার করেন তখন তিনি তাদের জমি বাজেয়াপ্ত না করে ক্রয় করে নেন

দুর্ভিক্ষের সময় হযরত উমর (রা.) নতুন একটি রীতির সূচনা করেন যা তিনি এর পূর্বে করতেন না। তা হল লোকদেরকে এশার নামায পড়িয়ে তিনি নিজ বাড়িতে প্রবেশ করতেন এবং রাতের শেষ প্রহর পর্যন্ত বিরতিহীন নামায পড়তে থাকতেন। এরপর তিনি (রা.) বের হতেন এবং মদীনার চারিপাশ প্রদক্ষিণ করতেন।

আঁ হযরত (সা.)-এর মহা মর্যাদাবান সাহাবী দ্বিতীয় খলীফায়ে রাশেদ ফারুক আযাম হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর পবিত্র জীবনালেখ্য। ”

আবদুল্লাহ্ বিন ইব্রাহীম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, মসজিদ নববীতে সর্বপ্রথম চাটাই বিছিয়েছেন হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)।

হযরত উমর (রা.)-এর যুগে সতেরো হিজরীতে মসজিদ নববীর সম্প্রসারণ হয়, আদমশুমারির সূচনা হয়, জনগণের মধ্যে রেশন ব্যবস্থা শুরু হয়, শূরা বা পরামর্শ সভা প্রতিষ্ঠিত হয়, যাকাত সংগ্রহের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কৃষিকাজের উন্নতির জন্য উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গৃহীত হয়।

“কেবল ইসলামই রাষ্ট্রীয় অধিকারও প্রতিষ্ঠিত করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে প্রত্যেক ব্যক্তির অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের এবং ইসলামই সর্বপ্রথম এ নীতি প্রচলন করেছে। ”

[আল মুসলেহ মওউদ (রা.)]

হযরত উমর (রা.)'র যুগে রাজ্যগুলোকে বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত করা হয়েছে। ২০ হিজরীতে হযরত উমর (রা.) রাজ্যগুলোকে আটটি প্রদেশে বিভক্ত করেন যেন প্রশাসনিক কাজে সুবিধা হয়। ১ম মক্কা, ২য় মদীনা, ৩য় সিরিয়া, ৪র্থ জাযিরা, ৫ম বসরা, ৬ষ্ঠ কূফা, ৭ম মিসর ও ৮ম ফিলিস্তিন।

যে ব্যক্তি কর্মকর্তা নির্বাচিত হত, তার কাছ থেকে এই অঙ্গীকার নেওয়া হত যে, সে তুর্কী ঘোড়ায় আরোহণ করবে না, মিহি (সুতার) কাপড় পরিধান করবে না, মিহি আটা খাবে না, দরজায় প্রহরী রাখবে না, অভাবীদের জন্য সদা দ্বারা খোলা রাখবে।

কর্মকর্তা নির্বাচন করার পর তাদের সহায় সম্পত্তির হিসাব নেওয়া হত। কোন কর্মকর্তার আর্থিক অবস্থায় অস্বাভাবিক প্রবৃদ্ধি হলে সে যদি যথাযথ সদুত্তর দিতে না পারত তাহলে সে শাস্তির সম্মুখীন হত এবং অতিরিক্ত সম্পদ বায়তুল মালে জমা করা হত।

আব্দুর রহমান উত্তরে বলেন, আমার বয়সের ধারণা এভাবে করতে পার, মহানবী (সা.) যখন হযরত উসামাহ্ বিন যায়েদ (রা.)-কে ১০ হাজার সাহাবীর সেনাপতি নিযুক্ত করে প্রেরণ করেছিলেন যাদের মাঝে হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.)ও ছিলেন, তখন হযরত উসামাহ্ বিন যায়েদ (রা.)'র বয়স যা ছিল আমার বয়স তার চেয়ে এক বছর বেশি।

কেন্দ্রীয় আর্কাইভ এবং রিসার্চ সেন্টার এর পক্ষ থেকে www.ahmadipedia.org ওয়েব সাইটের সূচনা হওয়ার ঘোষণা। ওয়েবসাইটটি পুরো জামাতের সহযোগিতায় একটি চলমান স্থায়ী প্রজেক্টে রূপান্তরিত হবে আর প্রত্যেক আহমদীর জন্য কল্যাণকর প্রমাণিত হবে, ইনশাআল্লাহ

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, প্রদত্ত ২ জুলাই, ২০২১, এর জুমুআর খুতবা (৫ ওফা, ১৪০০ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ -

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ - الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ -

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ -

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:আজকাল হযরত উমর (রা.)'র স্মৃতিচারণ অব্যাহত আছে। এ বিষয়ে আজও আলোচনা করবো। হযরত মুসলেহ্ ম ওউদ (রা.) বলেন, হযরত উমর (রা.) সম্পর্কে এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.)-এর এক নির্দেশনার ভিত্তিতে তিনি যখন ইহুদী এবং খ্রিস্টানদেরকে ইয়েমেন থেকে বহিষ্কার করেন তখন তিনি তাদের জমি বাজেয়াপ্ত না করে ক্রয় করে নেন। এ প্রসঙ্গে আরও বলেন, ইয়েমেনের জমি যা খ্রিস্টান ও ইহুদীদের অধীন ছিল তা খাজনার ভূমি ছিল কিন্তু যখন হযরত উমর (রা.) সেই জমি ইহুদী ও খ্রিস্টানদের কাছ থেকে নিয়ে নেন এবং তাদেরকে আরব উপদ্বীপ থেকে দেশান্তরিত করেন তখন তা রাজস্বভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও এবং নীতগতভাবে রাষ্ট্রকেই এর মালিক মনে করা হতো- তাসত্ত্বেও তিনি তাদের কাছ থেকে এই জমি ছিনিয়ে নেন নি বরং ক্রয় করেছেন। বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থ ফাতহুল বারীতে এই হাদীস লেখা আছে যে, عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ أَنَّ عُمَرَ أَجْلَى أَهْلَ نَجْرَانَ وَالْيَهُوْدَ وَالنَّصَارٰى وَاشْتَرٰى بَيَاضَ أَرْضِهِمْ وَكُرُوْمَهُمْ অর্থাৎ ইয়াহিয়া বিন সাঈদ বর্ণনা করেন, হযরত উমর (রা.) নাজরানের মুশরিক, ইহুদী এবং খ্রিস্টানদের সেখান থেকে দেশান্তরিত করেন এবং তাদের জমি ও বাগ-বাগিচা ক্রয় করে নেন। একথা স্পষ্ট যে, ইহুদীদের জমিন উশরী হতে পারে না কেননা তা উশরী হলে এর মালিক কোন মুসলমান হওয়ার কথা, সেক্ষেত্রে ইহুদীদের কাছ থেকে তা ক্রয় করার প্রশ্নই ছিল না। এসব জমি নিঃসন্দেহে রাজস্বভুক্ত বা খাজনার জমি ছিল যেমন হিন্দুস্তানের ভুমিকেও খারাজী বলা হয়। কিন্তু হযরত উমর (রা.) উক্ত জমিকে খারাজী আখ্যা দিয়ে, রাষ্ট্রকে এর মালিক আখ্যা দিয়েতা বাজেয়াপ্ত করেন নি বরং উক্ত জমি ক্রয় করেছেন। কেউ বলতে পারে, এই জমি মনে হয় খারাজীও ছিল না, উশরীও ছিল না, সম্ভবত অন্য কোন ধরণের ছিল। এমন ধারণা করা অবান্তর এবং ইসলামী শরীয়ত সম্পর্কে অজ্ঞতার পরিচায়ক হবে। উশরী এবং খারাজী ছাড়া ইসলামে আর কোন জমি নেই, তবে যে জমি

একক কোন মালিকানাধীন না হয়ে পতিত ভূমি হয়ে থাকে তার কথা ভিন্ন। তাই, নাজরানবাসী ইহুদী-খ্রিস্টান এবং মুশরিকদের জমি নিঃসন্দেহে খারাজী ছিল বা উশরী ছিল কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই হযরত উমর (রা.) জমির দখলদারকেই মালিক আখ্যা দিয়েছেন এবং তাদের কাছ থেকে সেই জমি ক্রয় করা হয়েছে।

(ইসলাম অউর মিলকিয়াতে যমীন, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২১, পৃ : ৪৪৪, ৪৭৮-৪৭৯)

ইসলামে যুদ্ধবন্ধী ছাড়া অন্য কাউকে ক্রীতদাস বানানোর নিষেধাজ্ঞার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا অর্থাৎ হে মুসলমানেরা! তোমরা কি অন্যান্য লোকদের ন্যায় বিজাতীয়দের পাকড়াও করে নিজেদের শক্তি-সামর্থ্য বৃদ্ধি করতে চাও ***'ওয়াল্লাহু ইউরিদুল আখিরাহ'***, তোমরা পার্থিবতার পেছনে ছুটে বেড়াবে এটি আল্লাহ্ চান না বরং তিনি তোমাদেরকে সেসব বিধিবিধান অনুসারে পরিচালিত করতে চান যা পরিণামের দিক থেকে তোমাদের জন্য উত্তম এবং যা পরকালে তোমাদেরকে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি ও ভালোবাসার যোগ্যপাত্র বানাবে। আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টিএবং পরিণাম উত্তম হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে এ বিধানই তোমাদের জন্য অধিকতর শ্রেয় যে, তোমরা যুদ্ধবন্দীদেরকে ছাড়া যাদেরকে যুদ্ধের সময় বন্দী করা হয় অন্য কাউকে বন্দী করবে না। এক কথায় যুদ্ধবন্দী ছাড়া অন্য কোন ধরনের বন্দী বানানো ইসলামে বৈধ নয়। এই নির্দেশ ইসলামের প্রথম দিকে কঠোরভাবে পালন করা হতো অর্থাৎ হযরত উমর (রা.)'র খিলাফতকালে একবার ইয়েমেনের এক প্রতিনিধি দল তাঁর কাছে আসে এবং অভিযোগ করে যে, আমরা স্বাধীন গোত্র ছিলাম, ইসলামের পুর্বে আমাদেরকে খ্রিস্টানরা জোরপূর্বক কোন যুদ্ধ ছাড়াই দাস বানিয়ে নিয়েছিল। আমাদেরকে এই দাসত্ব থেকে মুক্ত করা হোক। হযরত উমর (রা.) বলেন, যদিও এটি ইসলামের পুর্বের ঘটনা তবুও আমি বিষয়টির তদন্ত করব। যদি তোমাদের কথা সঠিক হয় তাহলে তোমাদেরকে তৎক্ষণাৎ মুক্ত করে দেওয়া হবে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্তমান ইউরোপের সাথে এর তুলনা করছেন যে, এটিই ছিল ইসলামী শিক্ষা যার ওপর হযরত উমর (রা.) আমল করিয়েছেন বা এ সম্পর্কে তাদের আশ্বস্ত করেছেন কিন্তু এর বিপরীতে ইউরোপে কী হয়? ইউরোপ নিজেদের ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষির প্রসার ও বিস্তারের জন্য উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকেও এই দাসপ্রথা বহাল রাখে। এতে কোন সন্দেহ নেই, ইসলামের ইতিহাস থেকে অমুসলিম দাসত্বের বিষয়টিও আমরা জানতে পারি কিন্তু তা সত্ত্বেও দাসদের মাধ্যমে দেশীয় পর্যায়ে শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উন্নতির বিষয়টি কোথাও দৃষ্টিগোচর হয় না।

(ইসলাম কা ইকতিসাদি নিযাম, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৮, পৃ : ২৬-২৭)

আর ইসলামে এর কোন অস্তিত্বই নেই।

হযরত উমর (রা.)'র যুগে একবার ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় আর মদীনা ও এর চতুষ্পার্শ্বে চরম দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। যখন প্রচন্ড বাতাস প্রবাহিত হত তখন ছাইয়ের মত মাটি উড়ে আসত এজন্য এ বছরের নাম 'আমুর রামাদা' বা ছাইয়ের বছর রাখা হয়। (তারিখুত তাবারী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫০৮)

অওফ বিন হারেস তার পিতার বরাতে বর্ণনা করেন যে, এই বছরের নাম আমুর রামাদা অর্থাৎ ছাইয়ের বছর রাখা হয় কেননা, অনাবৃষ্টির কারণে পুরো ভূমি কালো হয়ে ছাই সদৃশ হয়ে গিয়েছিল আর এই অবস্থা নয় মাস পর্যন্ত ছিল। হিযাম বিন হিশাম তার পিতার বরাতে বর্ণনা করেন, ১৮ হিজরীতে যখন লোকেরা হজ্জ থেকে ফেরত আসে তখন তারা খুবই কষ্টের সম্মুখীন হয়। দেশে চরম অনাবৃষ্টি দেখা দেয়, গবাদি পশু মারা যায় এবং লোকেরা না খেয়ে মরতে থাকে, এমনকি মানুষ নরম হাড় পিষে তা পানিতে মিশিয়ে খেতে আরম্ভ করে। আর ইদুরের গর্ত খুড়ে সেখানে যা থাকত তা বের করে আনত। হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) হযরত আমর বিন আ'স (রা.)'র উদ্দেশ্যে সেই বছর অর্থাৎ আমুর রামাদাতে চিঠি লিখেন।

' বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। 'আল্লাহ্র বান্দা উমর আমীরুল মু'মিনীন এর পক্ষ থেকে আ'সী বিন আ'সীর নামে এই পত্র। তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, এরপর বলছি, তুমি কি আমাকে এবং যারা আমার সাথে আছে তাদেরকে মৃত দেখতে চাও আর তুমি ও তোমার কাছে যারা আছে তারা জীবিত থাকবে? আর কোন সাহায্যকারী আছে কী? তিনি (রা.) তিনবার লিখেন, সাহায্য! সাহায্য! সাহায্য!'

এর উত্তরে হযরত আমর বিন আ'স (রা.) লিখেন,

'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম। আল্লাহ, যিনি ছাড়া আর কেউ ইবাদতের যোগ্য নয় তাঁর বান্দার প্রতি। আম্মা বা'দ! আপনার কাছে সাহায্য পৌঁছে যাচ্ছে, স্বল্পকাল অপেক্ষা করুন। আমি আপনাদের অভিমুখে উটের একটি কাফেলা প্রেরণ করছি যার প্রথম উট আপনার কাছে থাকবে এবং শেষ উট আমার কাছে থাকবে অর্থাৎ উটের একটি দীর্ঘ সারি পাঠানো হবে। মিসরের গভর্নর হযরত আমর বিন আ'স (রা.) খাদ্যশস্য বোঝাই এক হাজার উট প্রেরণ করেন। ঘি এবং কাপড় প্রভৃতি এর বাইরে ছিল। ইরাকের গভর্নর হযরত সা'দ খাদ্যশস্য বোঝাই তিন হাজার উট প্রেরণ করেন, কাপড় ও অন্যান্য উপকরণ এর বাইরে ছিল। সিরিয়ার গভর্নর হযরত আমীর মুয়াবিয়া দুই হাজার উট বোঝাই খাদ্যশস্য প্রেরণ করেন, কাপড় ও অন্যান্য উপকরণ এর বাইরে ছিল। খাদ্যশস্যের প্রথম কাফেলা যখন আসে তখন হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.) হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.)-কে বলেন, তুমি কাফেলাকে থামিয়ে গ্রামবাসীদের দিকে পাঠিয়ে দাও এবং প্রথমে তাদেরকে দাও আর তাদের মাঝে তা বন্টন করে দাও। আল্লাহ্র কসম! হতে পারে মহানবী (সা.)-এর সান্নিধ্যের পর এর চেয়ে উত্তম কিছু হয়ত তোমরা পাওনি। এগুলোর বস্তা দিয়ে লেপ বানিয়ে দাও যা তারা পরিধান করবে এবং উটগুলো তাদের জন্য জবাই করে দিও যেন তারা এর মাংস খেতে পারে এবং এর চর্বি সংরক্ষণ করে। তুমি তাদের একথা বলার অপেক্ষা করো না যে, আমরা বৃষ্টি আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব।আল্লাহ্ তা'লার স্বাচ্ছন্দ্য দেওয়ার আগে পর্যন্ত তারা যেন আটা রান্না করে এবং অবশিষ্ট মজুদ করে। অর্থাৎ তারা যেন কিছু আটা রান্না করে নিজেরা খেয়ে বাকিটুকু মজুদ করে। হযরত উমর (রা.) খাবার প্রস্তুত করার নির্দেশ দিতেন এবং একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দিয়ে বলতো, যে ব্যক্তি খাবার খাওয়ার জন্য আসতে ও খেতে চায় চায় সে যেন এমনটি করে। আর যে ব্যক্তি তার পরিবারের কাছে খাবার নিয়ে যেতে চায় সে নিয়ে যেতে পারে। হযরত উমর (রা.) লোকদেরকে 'শরীদ' খাওয়াতেন। রুটি ছিড়ে ঝোলে ভিজিয়ে প্রস্তুত করা খাবারকে 'শরীদ' বলা হয়। এটি এক ধরণের রুটি যার সাথে জলপাইয়ের তৈরী তরকারী যা ডেকচিতে চটজলদি রান্না করা হতো। উট জবাই করা হতো এবং হযরত উমর (রা.) নিজেও সবার সাথে বসে সেভাবেই খাবার খেতেন যেভাবে অন্যরা খাবার খেত।

আব্দুল্লাহ বিন যায়েদ বিন আসলাম তার দাদা আসলাম (রা.)'র বরাতে বর্ণনা করেন, হযরত উমর (রা.) টানা রোযা রাখতে থাকেন। আমুর রামাদাহ্'র যুগে সন্ধ্যাবেলায় হযরত উমর (রা.)'র কাছে জলপাই-এর তেল মিশ্রিত রুটি পরিবেশন করা হতো। একদিন লোকেরা উট জবাই করে লোকদেরকে আহার করায়। তারা হযরত উমর (রা.)'র জন্য উটের মাংসের উপাদেয় অংশটি রেখে দিয়েছিল। যখন সেগুলো তাঁর সামনে পরিবেশন করা হয় তখন দেখা গেল, সেখানে উটের কুঁজের মাংস ও কলীজার টুকরো ছিল। যখন হযরত উমর (রা.) জানতে চান, এগুলো কোথা থেকে এসেছে, তখন উত্তরে বলা হল, হে আমীরুল মু'মিনীন এগুলো সেই উটের মাংসের অংশ যেগুলো আজ আমরা জবাই করেছি। হযরত উমর (রা.) বলেন, বড়ই পরিতাপের বিষয়। আমি যদি নিজে (উটের) উপাদেয় অংশ খাই আর অন্যদেরকে মন্দ অংশ খাওয়াই, তবে আমি কতই না মন্দ তত্ত্বাবধায়ক সাব্যস্ত হব! এই মাংসের বাটি নিয়ে যাও আর অন্য কোন খাবার থাকলে সেটা আমার জন্য নিয়ে আস। এরপর তাঁর জন্য রুটি এবং জলপাই এর তেল আনা হয়। তিনি নিজ হাতে রুটি গুলো ছোট ছোট টুকরো করে শরীদ বানান। তারপর তিনি তাঁর ভৃত্যকে বলেন, হে ইয়ারফা', তোমার মঙ্গল হোক। এই বাটি সামাকের একটি বাড়িতে নিয়ে যাও। সামাক মদীনার নিকটবর্তী একটি খেজুরের বাগানের নাম ছিল, যার মালিক ছিলেন হযরত উমর (রা.)। তিনি সেই বাগানটি ওয়াক্ফ করে দিয়েছিলেন। হযরত উমর (রা.) বলেন, তিন দিন হয়ে গিয়েছে আমি সেই বাড়িতে কোন খাবার পাঠাইনি। আমার ধারণা হল, তারা অভুক্ত আছেন। এই বাটি নিয়ে তাদের সামনে পরিবেশন কর।

হযরত ইবনে উমর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত, দুর্ভিক্ষের সময় হযরত উমর (রা.) নতুন একটি রীতির সূচনা করেন যা তিনি এর পূর্বে করতেন না। তা হল লোকদেরকে এশার নামায পড়িয়ে তিনি নিজ বাড়িতে প্রবেশ করতেন এবং রাতের শেষ প্রহর পর্যন্ত বিরতিহীন নামায পড়তে থাকতেন। এরপর তিনি (রা.) বের হতেন এবং মদীনার চারিপাশ প্রদক্ষিণ করতেন। একরাতে সেহরীর সময় আমি তাঁকে (রা.) এই দোয়াটি পড়তে শুনেছি: "আল্লাহুম্মা লা তাজআল হালাকা উম্মাতি মুহাম্মাদিন আলা ইদাইয়া"। অর্থাৎ হে আমার আল্লাহ্! আমার হাতে মুহাম্মদ (সা.)-এর উম্মতকে ধ্বংস করো না।

মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া বিন হিব্বান (রা.) বর্ণনা করেন, দুর্ভিক্ষের সময় একদিন হযরত উমর (রা.)'র নিকট চর্বিতে ডুবানে রুটি পরিবেশন করা হয়। তিনি (রা.) এক মরুবাসীকে ডেকে তাকে পাশে বসান আর সে তাঁর (রা.) সাথে বসে খাবার খেতে থাকে। সে ব্যক্তি দ্রুত বাটির কিনারা থেকে চর্বি খাচ্ছিল। এটি দেখে হযরত উমর (রা.) বলেন, তুমি এমন ভাবে খাচ্ছ যেন জীবনে কখন চর্বি দেখনি! সেই ব্যক্তি নিবেদন করে, অনেকদিন যাবৎ আমি ঘি-ও খাইনি আর জলপাইও আমার কপালে জুটেনি। শুধু যে নিজে খেতে পাইনি তা-ই নয়, অন্য কাউকেও আমি এগুলো খেতে দেখিনি। এটি শুনে হযরত উমর (রা.) শপথ করেন যে, লোকেরা পূর্বের ন্যায় স্বচ্ছল না হওয়া পর্যন্ত তিনি মাংস বা ঘি কোনটাই মুখে তুলবেন না।

ইবনে তাউস তার পিতার বরাতে বর্ণনা করেন, জনগণের সুদিন ফেরার আগ পর্যন্ত হযরত উমর (রা.) মাংস বা ঘি কোনটাই খান নি। ঘি জাতীয় খাবার না খেয়ে শুধুমাত্র তেল জাতীয় খাবার খাওয়ার কারণে তার (রা.) পেটে গুড়গুড় করত। তিনি (রা.) তাঁর পেটকে সম্বোধন করে বলতেন, তুমি গুড়গুড় করতে থাকো, আল্লাহ্র কসম! যতদিন লোকদের সুদিন না আসবে এবং যতদিন তারা পূর্বের মত খাবার আরম্ভ না করবে, তেল ছাড়া তোমার ভাগ্যে আর কিছু জুটবে না।

ইয়্যায বিন খলীফা বলেন, দুর্ভিক্ষের বছর হযরত উমর (রা.)-কে আমি

দেখেছি, তাঁর (গায়ের) রং কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করেছিল, অথচ পূর্বে তিনি ফর্সা ছিলেন। আমরা জিজ্ঞেস করি, এটি কীভাবে হল? তখন বর্ণনাকারী উত্তরে বলেন, হযরত উমর (রা.) একজন আরব ছিলেন, তিনি ঘি ও দুধ ব্যবহার করতেন। কিন্তু মানুষ দুর্ভিক্ষের শিকার হলে মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে না আসা পর্যন্ত নিজের জন্য তিনি এগুলোকে হারাম করে নিয়েছিলেন। হযরত উমর (রা.) তেল দিয়ে খাবার খেতেন যে কারণে তাঁর গায়ের রং পাল্টে যায় আর অনাহারের কারণে তাঁর গায়ের রং আরও বেশি বদলে যায়।

উসামাহ্ বিন যায়েদ বিন আসলাম তার দাদার বরাতে বর্ণনা করেছেন, আমরা বলতাম- আল্লাহ্ যদি দুর্ভিক্ষ দূর না করেন তাহলে হযরত উমর (রা.) মুসলমানদের জন্য দুশ্চিন্তা করে মরেই যাবেন।

যায়েদ বিন আসলাম নিজ পিতার বরাতে বর্ণনা করেন, দুর্ভিক্ষের যুগে গোটা আরব থেকে মানুষ মদীনা আসে। হযরত উমর (রা.) লোকদের নির্দেশ দিয়েছিলেন, তারা যেন তাদের (থাকার) ব্যবস্থা করে এবং তাদেরকে খাবার খাওয়ায়। মদীনার চার দিকেই বিভিন্ন সাহাবীকে দায়িত্বে নিয়োজিত করেছিলেন, তারা তাঁকে সন্ধ্যার সময় একত্র হয়ে প্রতি মুহূর্তের সংবাদ দিতেন। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত যেসব সংবাদই (সংগৃহীত) হত সেই সংবাদ সন্ধ্যায় তাঁর নিকট পৌঁছে দেওয়া হত। মদীনার বিভিন্ন অঞ্চলের বেদুঈনরা এসেছিল। একরাতে রাতের খাবারের পর হযরত উমর (রা.) নির্দেশ দেন, আমাদের সাথে যারা রাতের খাবার খেয়েছে তাদের সংখ্যা গণনা কর। অতএব, তাদের গণনা করলে তাদের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় সাত হাজার জন। এরপর তিনি (রা.) বলেন, যারা আসে নি তাদের এবং রোগী ও শিশুদেরও গণনা কর। গণনা করার পর দেখা গেল তাদের সংখ্যা ছিল চল্লিশ হাজার। কিছু দিন পর এই সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তাই পুনরায় গণনা করা হয়। যারা তাঁর সাথে খাবার খাচ্ছিল তাদের সংখ্যা হয় দশ হাজার এবং অন্যদের সংখ্যা দাঁড়ায় পঞ্চাশ হাজার। এভাবেই এ ধারা অব্যাহত থাকে আর এক পর্যায়ে আল্লাহ্ তা'লা বৃষ্টি বর্ষণ করেন। বৃষ্টি হওয়ার পর আমি হযরত উমর (রা.)-কে দেখি, তিনি তাঁর কর্মকর্তাদেরকে নির্দেশ দেন, তারা যেন সবাইকে তাদের নিজ নিজ অঞ্চলে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন আর তাদেরকে খাদ্যশস্য এবং বাহনও সরবরাহ করেন। বর্ণনাকারী বলেন, আমি দেখেছি সেই লোকদের যাত্রা করানোর জন্য হযরত উমর (রা.) নিজেই আসতেন।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা, ৩য় ভাগ, পৃ: ১৬৫-১৬৯) (লুগাতুল হাদীস, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৩৪) (ফাতহুল বারি শারাহ সহীহুল বুখারী, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪৬০-৪৬১)

আশেপাশের মানুষ ক্ষুধার তাড়নায় অতিষ্ঠ হয়ে (গ্রাম) ছেড়ে শহরে চলে এসেছিল এখানে তারা খাবার পেত। পরিস্থিতি যখন স্বাভাবিক হয়ে যায়, বৃষ্টি হয় আর চাষাবাদ ইত্যাদি করা সম্ভবপর ছিল, তখন তিনি (রা.) বলেন, এখন ফিরে যাও, পরিশ্রম কর আর চাষাবাদ কর।

তাবরীর ইতিহাসে এই দুর্ভিক্ষ দূর হওয়া সম্পর্কে লেখা আছে, এক ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে, যাতে মহানবী (সা.) দোয়া করার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করেছেন। এ প্রেক্ষিতে হযরত উমর (রা.) মানুষের মাঝে ঘোষণা করান যে, এস্তেস্কার নামায (অর্থাৎ বৃষ্টি জন্য নামায) পড়া হবে। হযরত উমর (রা.) বলেন, বিপদ চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে, এখন আল্লাহ্ চাইলে এর অবসান ঘটতে যাচ্ছে। যে জাতি দোয়া করার সুযোগ লাভ করে তাদের বুঝে নেওয়া উচিত যে, তাদের বিপদ কেটে গেছে। তিনি (রা.) বিভিন্ন শহরের গভর্নরদের উদ্দেশ্যে পত্র লেখান যে, তোমার মদীনা এবং এর আশেপাশে বসবাসরত আল্লাহ্‌র বান্দাদের জন্য এস্তেস্কার নামায পড়, কেননা তাদের বিপদ চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এস্তেস্কার নামায পড়ার জন্য হযরত উমর (রা.) মুসলমানদেরকে বাইরে উন্মুক্ত মাঠে সমবেত করেন আর হযরত আব্বাস (রা.)-কে সাথে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হন, সংক্ষিপ্ত খুতবা দেন এবং নামায পড়ান আর এরপর পা ভাজ করে বসে দোয়া করতে আরম্ভ করেন। اَللّٰهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَارْضَ عَنَّا "হে আল্লাহ্! আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং তোমার কাছেই সাহায্য যাচনা করি। হে আল্লাহ্! আমাদের ক্ষমা কর, আমাদের প্রতি অনুগ্রহ কর এবং সন্তুষ্ট হও।" এরপর তিনি (রা.) ফিরে যান। বাড়িতে পৌঁছানোর পূর্বেই বৃষ্টির কারণে মাঠে পানি জমে যায়। (তারিখে তাবরী, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫০৮-৫০৯)

একটি রেওয়ায়েত অনুযায়ী হযরত উমর (রা.) এভাবে দোয়া করেন, "হে আল্লাহ্! তোমার নবী (সা.)-এর যুগে আমরা যখন খরা পীড়িত হতাম তখন তোমার নবী (সা.)-এর দোয়াই দিয়ে বৃষ্টির জন্য দোয়া করতাম আর তুমি আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করতে। আজ আমরা তোমার নবী (সা.)-এর চাচার দোহাই দিয়ে দোয়া করছি। অতএব, তুমি আমাদের এই দুর্ভিক্ষ দূর করে দাও আর আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ কর।" এরপর লোকদের নিজ নিজ স্থান ত্যাগ করার পূবেই বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়।

(আত্তাবাকাতুল কুবরা লি ইবনে সাআদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ২১)

মসজিদে নববীতে কবে থেকে চাটাই বা মাদুর বিছানো শুরু হয়েছিল সে সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ্ বিন ইব্রাহীম বর্ণনা করেছেন, প্রথমে মানুষ নামায পড়ত, মাটিতে বা কাঁচা মেঝেতে। ফলে মানুষের কপালে মাটি লেগে যেত। কিন্তু পরবর্তীতে চাটাইবা মাদুর বিছানোরা প্রথা চালু হয়। এ সম্পর্কে আবদুল্লাহ্ বিন ইব্রাহীম কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, মসজিদ নববীতে সর্বপ্রথম চাটাই বিছিয়েছেন হযরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)। প্রথমে মানুষ সিজদা থেকে মাথা উঠানোর পর নিজেদের হাত ঝেড়ে নিত। এটি দেখেতিনি (রা.) চাটাই বিছানোর নির্দেশ দেন আর তা আকীক থেকে এনে মসজিদে নববীতে বিছানো হয়। আকীকও একটি উপত্যকার নাম যা মদীনার দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে উত্তর-পশ্চিমে প্রায় ১৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত উপত্যকা। এটি অনেক বড় একটি উপত্যকা ছিল।

(ইযালাতুল খাফা আন খিলাফাতিল খুলাফা, অনুবাদ: শাহ ওলী উল্লাহ্, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৩৬) (আসসীরাতুন্নাবুবী, পৃ: ১৬৮)

হযরত উমর (রা.)'র যুগে ১৭ হিজরী সনে মসজিদে নববীর সম্প্রসারণও করা হয়। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.)-এর যুগে মসজিদ কাঁচা ইট দ্বারা নির্মিত হয়েছিল আর এর ছাদ খেজুরের শাখা ও পাতা দিয়ে বানানো হয় এবং খুঁটি ও স্তম্ভ ছিল খেজুর গাছের গুড়ি দিয়ে তৈরি। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) একে সেভাবেই থাকতে দেন এবং এতে কোন সম্প্রসারণ কিংবা পরিবর্তন করেন নি। হযরত উমর (রা.) এর পু নঃনির্মাণ এবং সম্প্রসারণ করান। কিন্তু এর আকৃতি ও কাঠামোতে কোন পরিবর্তন করান নি। তিনিও একে একই রকম নির্মাণ শৈলীতে নির্মাণ করান। সেই আগের মতই খেজুর পাতার ছাদ থাকে। তিনি (রা.) কেবল কাঠের খুঁটি লাগিয়ে দিয়েছিলেন। হযরত উমর (রা.) নিজের তত্ত্বাবধানে ১৭ হিজরী সনে মসজিদে নববীর নির্মাণকাজ সম্পন্ন করান। এই সম্প্রসারণের পর মসজিদের আয়তন ১০০ঢ১০০ বর্গগজ, অর্থাৎ ৫০ঢ৫০ বর্গমিটার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১৪০ঢ১২০ বর্গগজ, অর্থাৎ ৭০ঢ৬০ বর্গমিটারে দঁ াড়ায়। এই বর্ণনা থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে, হযরত আবু বকর (রা.)'র যুগে মসজিদে নববী ঠিক তেমনই ছিল যেমনটি মহানবী (সা.)-এর যুগে ছিল। কিন্তু হযরত উমর (রা.)'র পুনঃনির্মাণের পর এর আয়তন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। (তিনি বলেন), হযরত উমর (রা.) মসজিদে নববী পু নঃনির্মাণের এবংলোকদেরকে বৃষ্টি থেকে বঁ াচানোর ব্যবস্থা করার নির্দেশ দেন। কিন্তু অনেক বেশি সাজসজ্জা পরিহার করা বাঞ্ছনীয় কেননা এ ধরণের সাজসজ্জাই মানুষকে সমস্যায় জর্জরিত করে। হযরত উমর (রা.) এ কাজে মিতব্যয়িতা অবলম্বন করেন আর মসজিদকে তিনি ঠিক সেভাবেই মজবুত করে গড়ে তোলেন যেমনটি ছিল মহানবী (সা.)-এর পবিত্র যুগে। মসজিদ সম্প্রসারণের সময় মসজিদ সংলগ্ন উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের জমি অধিগ্রহণ করতে হয়েছিল। কিছু মানুষ সানন্দে ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজেদের জমি মসজিদের নামে দান করে দেন কিন্তু কিছু জমির জন্য হযরত উমর (রা.)-কে পারস্পরিক সমঝোতা এবং আর্থিক প্রণোদনা দেওয়ার পন্থা অবলম্বন করতে হয়। এভাবে তাঁকে কিছুটা জমি ক্রয় করে মসজিদের সাথে সন্নিবেশিত করতে হয়। (জুস্তজুয়ে মাদীনা, প্রণেতা- আব্দুল হামীদ কাদরী, পৃ: ৪৫৯)

হযরত উমর (রা.)'র যুগে আদমশুমারি প্রথাও শুরু হয় বা তিনি এর প্রবর্তন করেন এবং প্রাত্যহিক খাদ্যের চাহিদা পূরণের জন্য রেশন ব্যবস্থা চালু করা হয়। এক্ষেত্রে ইসলামী রাষ্ট্রের নিয়মনীতি কীভাবে পরিচালিত হতো আর পরে কী কী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং প্রশাসনিক বিষয়ে কী কী নতু নত্ব আনা হয়েছে- এ বিষয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন,মহানবী (সা.) মদীনা এসেই সর্বপ্রথম সম্পদহীনদেরকে সম্পদশালীদের ভাই বানিয়ে দেন। আনসাররা সম্পত্তির মালিক ছিল আর মুহাজিররা ছিল সম্পত্তিহীন। মহানবী (সা.) আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববন্ধন স্থাপন করেন আর একজন সম্পত্তির মালিককে একজন সম্পত্তিহীন লোকের সাথে যুক্ত করে দেন। এক্ষেত্রে কেউ কেউ এতটাই বাহুল্য করেন যে, সহায়-সম্পত্তি তো দূরের কথা কারো দু 'জন স্ত্রী থাকলে তারা তাদের মুহাজির ভাইদের জন্য এ প্রস্তাব দেন যে, তারা তাদের জন্য একজন স্ত্রীকে তালাক দিতেও প্রস্তুত আছেন; তারা নিঃসঙ্কোচে তাদের বিয়ে করে নিতে পারে। এটি ছিল সাম্যের প্রথম দৃষ্টান্ত যা মহানবী (সা.) মদীনায় যাওয়া মাত্রই প্রতিষ্ঠা করেন, কেননা প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন মদীনাতেই হয়েছিল। সেই যুগে তেমন অর্থসম্পদ ছিল না, তাই এ পন্থাই খোলা ছিল যে, ধনী-গরীবকে যেন পরস্পরের সাথে এভাবে মিলিয়ে দেয়া হয় যাতে তারা প্রত্যেকে খাবারের জন্য কিছু না কিছু পায়। এরপর এক যুদ্ধের সময় মহানবী (সা.) এই পন্থা অবলম্বন করেন, যদিও (পরবর্তীতে) এর কাঠামো বদলে দেন। এক যুদ্ধের সময় তিনি (সা.) জানতে পারেন, কারো কারো কাছে খাবার জন্য

যুগ খলীফার বাণী

সর্বদা অবিচলতা, নিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততা নিয়ে খিলাফতের সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকুন, সন্তানসন্ততিকে খিলাফতের কল্যাণ সম্পর্কে সচেতন করুন এবং যুগ খলীফার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখুন।

(২০১৯ সালে মার্শাল আইল্যাণ্ড জলসায় প্রদত্ত হুযুরের বার্তা)

দোয়াপ্রার্থী : Nur Jahan Begum, Kolkata (W.B)

কিছু ই নেই আর থাকলেও তা নিতান্তই অপ্রতুল, কিন্তু কারো কারো কাছে প্রচুর জিনিস রয়েছে। এ অবস্থা লক্ষ্য করে মহানবী (সা.) বলেন, যার কাছে যা কিছুই আছে তা নিয়ে এসো এবং এক স্থানে একত্র কর। অতএব, সব জিনিস আনা হলে তিনি (সা.) রেশন ব্যবস্থা চালু করেন। এক কথায় এক্ষেত্রেও সেই প্রক্রিয়াই চালু হল যে, সবাইকে খাবার পেতে হবে। যতদিন সম্ভব ছিল সবাই যার যার মত খেতে থাকে কিন্তু যখন এটি অসম্ভব হয়ে যায় এবং কারো কারো অভুক্ত থাকার শঙ্কা দেখা দেয় তখন মহানবী (সা.) বলেন, এখন তোমাদের পৃথক পৃথকভাবে খাবার খাওয়ার অনুমতি নেই, সবাই এখন একস্থান থেকে সমপরিমাণ খাবার পাবে। সাময়িক পরিস্থিতির নিরিখে এ সিদ্ধান্ত হয়েছিল; সোশ্যালিজম বা কমিউনিজম (তথা সমাজতন্ত্র কিংবা সাম্যবাদ)-এর ভাবধারা প্রতিষ্ঠা করা হয় নি। যাহোক, সাহাবীরা (রা.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর এ নির্দেশ আমরা এত কঠোরভাবে পালন করি যে, আমাদের কাছে একটি খেজুর থাকলে তা খাওয়াকে আমরা অনেক বড় বিশ্বাসঘাতকতা মনে করতাম এবং তা সরকারী ভাণ্ডারে জমা না করা পর্যন্ত স্বস্তি পেতাম না। এটি ছিল মহানবী (সা.) প্রদর্শিত দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত। যতদিন পরিস্থিতি অস্বাভাবিক ছিল ততদিন পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকে আর এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন মহানবী (সা.) ।

এরপর মহানবী (সা.)-এর যুগে প্রাচুর্যও আসে আর ইসলামের জন্য আল্লাহ্ তা'লা ধনভাণ্ডার খুলেও দেন, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছা ছিল, মহানবী (সা.)-এর পরবর্তী যুগেই যেন এ-সংক্রান্ত সার্বিক ব্যবস্থাপনা চালু হয় যাতে মানুষ একথা বলতে না পারে যে, এটি কেবল মহানবী (সা.)-এর বিশেষত্ব ছিল, অন্য কেউ এটি চালু করতে পারে না। প্রাচুর্য এলে পুরোনো ব্যবস্থাপনা চালু হয়ে যায় আর আল্লাহ্ তা'লা একে পরবর্তীতেও বহাল রাখার ব্যবস্থা করেছেন। সেটি কীভাবে? তিনি (রা.) লিখেন,অতএব একদিকে আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-এর হাতে একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন আর অন্যদিকে মদীনায় পৌঁছতেই আনসাররা তাদের সহায়-সম্পদ মুহাজিরদের সামনে উপস্থাপন করেন। মুহাজিররা বলেন, আমরা এ সমস্ত জায়গা-জমি বিনামূল্যে নিব না, আমরা এসব জমিতে কৃষক হিসেবে চাষাবাদ করব আর তোমাদের অংশ তোমাদেরকে প্রদান করব। কিন্তু এটি মুহাজিরদের পক্ষ থেকে তাদের একটি ইচ্ছার বহিঃপ্রকাশ ছিল মাত্র। আনসাররা তাদের ধনসম্পদ দানের ক্ষেত্রে কোন দ্বিধা করেন নি। এটি তেমনই যেমন সরকার রেশন দিচ্ছে ঠিকই কিন্তু কেউ তা গ্রহণ করছে না। এতে সরকারের ওপর কোন আপত্তি বর্তাবে না। এটিই বলা হবে যে, সরকার রেশন নির্ধারণ করে দিয়েছে নেওয়া বা না নেওয়ার বিষয়ে মানুষ স্বাধীন। অনুরূপভাবে আনসাররা সবকিছু দিয়ে দিলেও মুহাজিররা তা গ্রহণ না করলে-সেটি ভিন্ন কথা। মোটকথা ব্যবহারিকভাবে এই কাজ মহানবী (সা.) নিজ জীবদ্দশায়ই আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। এমনকি যখন বাহরাইনের বাদশাহ্ মুসলমান হয় তখন তিনি তাকে নির্দেশ দেন যে, তোমার দেশে যাদের কাছে জীবিকা নির্বাহের জন্য কোন জমি নেই তুমি তাদের মধ্য থেকে প্রত্যেক ব্যক্তিকে জীবনধারণের জন্য চার দিরহাম এবং পোশাক দান কর যেন তারা ক্ষুধার্ত ও বস্ত্র হীন অবস্থায় না থাকে। এরপর মুসলমানদের কাছে সম্পদ আসতে আরম্ভ করে। মুসলমানদের সংখ্যা যেহেতু স্বল্প ছিল আর সম্পদ বেশি ছিল তাই তখন কোন নতুন আইন প্রয়োগের প্রয়োজন অনুভব হয় নি, কেননা চাহিদা পূর্ণ হচ্ছিল। নীতি হল, আশঙ্কার সময় আইন প্রয়োগ করতে হয়। আর যখন আশংকা থাকে না তখন সরকার সে আইন প্রয়োগ করতে পারে আবার চাইলে না-ও করতে পারে। এ কথাগুলো কথা প্রসঙ্গে বললাম, কিন্তু এখন যে কথাটি বলতে চাচ্ছিলাম তা হল মহানবী (সা.)-এর (তিরোধানের) পর এই ব্যবস্থাপনা কীভাবে প্রচলিত হয়?

মহানবী (সা.) যখন মৃত্যু বরণ করেন আর মুসলমানরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়তে থাকে, তখন বিজাতিরাও ইসলাম গ্রহণ করতে থাকে। আরবরা তো একটি গোষ্ঠি এবং এক জাতিসত্তা হিসেবে বসবাস করত আর তারা পরস্পরের মাঝে সাম্যও বজায় রাখত। ইসলাম যখন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে আর বিভিন্ন জাতি ইসলামে প্রবেশ করতে আরম্ভ করে তখন তাদের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করা বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। অবশেষে হযরত উমর (রা.) সবার আদমশুমারি করান এবং রেশন দেওয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তণ করেন, যা বনু উমাইয়্যার যুগ পর্যন্ত চালু থাকে। ইউরোপিয়ান ঐতিহাসিকরাও এটি স্বীকার করে যে, সর্বপ্রথম আদমশুমারি হযরত উমর (রা.) করিয়েছিলেন আর তারা এটিও স্বীকার করে যে, হযরত উমর (রা.) এই সর্বপ্রথম আদমশুমারি জনগণের কাছ থেকে সম্পদ ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য নয়, বরং তাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করার জন্য করিয়েছিলেন। অন্যান্য সরকার আদমশুমারি করায় যেন জনগণের ওপর কাজ চাপানো যায় এবং তাদের সামরিক কাজে ব্যবহার করা যায়, কিন্তু হযরত উমর (রা.) এজন্য আদমশুমারি করান নি যে, মানুষ কুরবানির পশুতে পরিণত হবে, বরং এজন্য করিয়েছেন যেন তাদের পেট ভরার ব্যবস্থা হয়। এটি যেন বোঝা যায় যে, মানুষের সংখ্যা কত আর কতটা খোরাকের ব্যবস্থা করতে হবে। অতএব, আদমশুমারির পর সবাইকে একটি নির্দষ্ট পরিমাণে খাদ্য সরবরাহ করা হতো। এছাড়া যেসব প্রয়োজন অবশিষ্ট থাকত তার জন্য তাদেরকে মাসিক কিছু ভাতা দেওয়া হতো। এই বিষয়ে এত সতর্কতা অবলম্বন করা হতো যে, হযরত উমর (রা.)'র যুগে যখন সিরিয়া জয় হয় আর সেখান থেকে প্রচুর পরিমাণে জলপাইয়ের তেল আসে তখন তিনি একবার মানুষকে বলেন, (সবাই তখন জলপাইয়ের তেল পেতে থাকে), জলপাইয়ের ব্যবহারে আমার পেট ফেঁপে উঠে। অর্থাৎ হযরত উমরও সেখান থেকে তেল নিতেন, তিনি বলেন, আমি জলপাই অধিক ব্যবহার করলে আমার পেট ফেঁপে উঠে। তোমরা আমাকে অনুমতি দিলে আমি বায়তুল মাল থেকে সমপরিমাণ মূল্যের ঘি নিতে পারি। অর্থাৎ জলপাইয়ের মূল্য যতটা হয় সেই পরিমাণ মূল্যের ঘি নিতে কেননা জলপাই আমার স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয়। মোটকথা, এটি প্রথম পদক্ষেপ ছিল যা ইসলাম ধর্মে মানুষের প্রয়োজন পূর্ণ করার জন্য গ্রহণ করা হয়েছিল। আর জানা কথা যে, যদি এই ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তাহলে এর পর আর কোন ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন থাকে না, কেননা পুরো দেশের প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব তখন সরকারের ওপর থাকবে। তাদের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা তাদের অসুস্থতায় চিকিৎসা এগুলোর সবই ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্বে থাকবে। যদি এসব চাহিদা পূরণ হতে থাকে তাহলে কোনরূপ বীমা ইত্যাদির প্রয়োজন থাকে না। বীমা তো মানুষ এজন্যই করিয়ে থাকে যেন তারা নিজেদের অবর্তমানে সন্তানদের জন্য কিছু রেখে যেতে পারে; কিংবা যখন বার্ধক্যে উপনীত হবে, উপার্জনক্ষম থাকবে না- তখন যেন নিজেদের চাহিদা পূরণ করতে পারে। যদি রাষ্ট্র এই দায়িত্ব নিয়ে নেয়, তাহলে আর কোন ধরনের বীমার প্রয়োজন থাকে না। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) আরও লিখেন, কিন্তু পরবর্তীতে আগতরা একথা বলতে আরম্ভ করে যে, এটি বাদশাহ্‌র ইচ্ছাধীন; তিনি চাইলে কিছু দিতেও পারেন অথবা চাইলে না-ও দিতে পারেন। যেহেতু তখন পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষা সম্পূর্ণভাবে প্রোথিত হয় নি, তাই তারা পুনরায় রোমান ও পারসীদের রীতি-নীতির প্রতি ঝুঁকে পড়ে। অন্য রাজা-বাদশাহ্‌রা যেমনটি করত, সেই রীতিই পরবর্তীতে প্রচলিত হয়ে যায়।

(তফসীরে কবীর, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৩৩৪-৩৩৬)

প্রত্যেক নাগরিকের জন্য ইসলামী রাষ্ট্রের অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করার বিষয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) আরও বলেন,ইসলামী রাষ্ট্র যখন সেই সম্পদের অধিকারী হয়, তখন তা প্রত্যেক ব্যক্তির অন্ন-বস্ত্রের ব্যবস্থা করে। এখন [এটিই বর্ণিত হয়েছে যে,] হযরত উমর (রা.)'র যুগে যখন ব্যবস্থাপনা সুসংগঠিত হয়, তখন ইসলামী শিক্ষা অনুসারে প্রত্যেক নাগরিকের জন্য অন্ন ও বস্ত্রের সংস্থান করার দায়িত্ব ছিল রাষ্ট্রের, আর তা নিজের এই কর্তব্য পূর্ণ দায়িত্বশীলতার সাথে পালন করত। হযরত উমর (রা.) এতদুদ্দেশ্যে আদমশুমারির প্রচলন করেন এবং রেজিস্টার চালু করেন, যাতে সব নাগরিকের নাম লিপিবদ্ধ করা হতো। [যেভাবে পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে,] ইউরোপীয় লেখকগণও একথা স্বীকার করেন যে, সর্বপ্রথম আদমশুমারি হযরত উমর (রা.) করেন এবং তিনিই রেজিস্টারের পদ্ধতি চালু করেন। এই আদমশুমারির উদ্দেশ্য ছিল প্রত্যেক ব্যক্তির অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান করা। রাষ্ট্রের জন্য এটিজানা আবশ্যক যে, দেশের জনসংখ্যা কত। আজ একথা বলা হয় যে, সোভিয়েত-রাশিয়া দরিদ্রদের অন্ন ও বস্ত্রের সংস্থান করেছে। অথচ সর্বপ্রথম এ ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার প্রচলন করেছিল ইসলাম, আর কার্যত হযরত উমর (রা.)'র যুগে প্রতিটি গ্রাম, প্রতিটি শহরতলী ও প্রতিটি শহরের সব নাগরিকের নাম রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করা হতো; প্রত্যেক ব্যক্তির স্ত্রী-সন্তানদের নাম এবং তাদের সংখ্যা লিখে রাখা হতো আর প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য খাদ্যেরও একটি সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছিল, যেন যারা স্বল্পাহারী তারাও তা দিয়ে চলতে পারে, আর যারা বেশি খায় তারাও নিজেদের প্রয়োজন অনুসারে খেতে পারে।

ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে, হযরত উমর (রা.) প্রথমদিকে যে সিদ্ধান্ত দিয়েছিলেন, তাতে দুগ্ধপোষ্য শিশুদের কথা বিবেচনা করা হয় নি আর তাদেরকে তখনই শস্য ইত্যাদি রূপে কোন সাহায্য প্রদান করা হতো, যখন মায়েরা তাদের সন্তানদের দুধ ছাড়িয়ে দিতো। [যেভাবে বিগত খুতবায় আমি বর্ণনা করেছিলাম,] একরাতে হযরত উমর (রা.) জনগণের অবস্থা জানার জন্য টহল দিচ্ছিলেন; হঠাৎ একটি তাঁবু থেকে কোন শিশুর কান্নার শব্দ ভেসে আসে। হযরত উমর (রা.) সেখানে দাঁড়িয়ে পড়েন; শিশুটি কেঁদেই যাচ্ছিল এবং মা তাকে পিঠে হাত বুলিয়ে, আদর করে ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করছিল। এভাবে দীর্ঘসময় অতিবাহিত হওয়ার পর হযরত উমর (রা.) সেই তাঁবুর ভেতরে যান এবং সেই নারীকে বলেন, তুমি বাচ্চাকে দুধ কেন খাওয়াচ্ছ না? এ কতক্ষণ ধরে কাঁদছে! সেই নারী তাকে (রা.) চিনতে পারে নি, সে ভেবেছে সাধারণ কোন লোক হবে হয়ত; সে উত্তরে বলে, তুমি কি জান না, উমর সিদ্ধান্ত দিয়ে দিয়েছেন যে, দুগ্ধপোষ্য শিশুরা রেশন পাবে না? আমরা দরিদ্র মানুষ, কষ্টেসৃষ্টে আমাদের দিন চলে। আমি এই বাচ্চার দুধ ছাড়িয়ে দিয়েছি যেন বায়তুল মাল থেকে তার জন্যও রেশন পাওয়া যায়। এ যদি এখন কাঁদে, তবে সেই কান্নার জন্য উমর দায়ী হবে, যে এমন আইন বানিয়েছে! হযরত উমর (রা.) তৎক্ষণাৎ ফিরে আসেন এবং পথিমধ্যে তিনি অত্যন্ত দুঃখের সাথে একথা বলতে থাকেন যে, উমর! উমর! জানি না এ আইনের মাধ্যমে আরবের কত শিশুদের দুধ ছাড়িয়ে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে তুমি

দুর্বল করেছ। এর সমুদয় পাপ এখন তোমার ওপর বর্তাবে। একথা বলতে বলতে তিনি এসে গুদামের দরজা খুলেন এবং আটার একটি বস্তা নিজের কাঁধে তুলে নেন। জনৈক ব্যক্তি বলেন, আমাকে দিন, এটি আমি বহন করব। হযরত উমর (রা.) বলেন, না ভুল আমি করেছি, তাই পরিণামও আমাকেই ভোগ করতে হবে। অতএব, আটার সেই বস্তাটি তিনি ঐ নারীর কাছে পৌঁছে দেন আর পরদিনই নির্দেশ জারি করেন যে, শিশু যেদিন জন্ম নিবে সেদিন থেকেই তার জন্য রেশন নির্ধারিত হবে, কেননা তার মা, যে তাকে দুধ পান করায়, তার অধিক খাবারের প্রয়োজন।

(ইসলাম কা ইকতিসাদি নিযাম, আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-১৮, পৃ: ৬১-৬২)

এরপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, কেবল ইসলামই রাষ্ট্রীয় অধিকারও প্রতিষ্ঠিত করেছে। ইসলামের দৃষ্টিতে প্রত্যেক ব্যক্তির অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের এবং ইসলামই সর্বপ্রথম এ নীতি প্রচলন করেছে। এখন অন্যান্য রাষ্ট্রও এর অনুকরণ করছে, কিন্তু পূর্ণরূপে নয়। বীমা করা হচ্ছে, ফ্যামিলি পেনশন দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু যৌবন ও বার্ধ্যক্য উভয় কালেই খাদ্য ও বস্ত্রের দায়িত্ব রাষ্ট্রের- এ নীতি ইসলামের পূর্বে অন্য কোন ধর্ম উপস্থাপন করেনি। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্র আদমশুমারি এজন্য করায়যেন ট্যাক্স নেওয়া যায় বা সৈন্য নিয়োগের ব্যাপারে ধারণা করা যায় যে, প্রয়োজনের সময় ক'জন যুবক পাওয়া যাবে। কিন্তু ইসলামী রাষ্ট্রে সর্বপ্রথম আদমশুমারি, যা হযরত উমর (রা.)'র যুগে করা হয়েছিল, তার উদ্দেশ্য ছিল সব মানুষের খাদ্য ও বস্ত্র সরবরাহ করা,তা ট্যাক্স বসানোর জন্য ছিল না বা এ ধারণা নেয়ার জন্য নয় যে, প্রয়োজনের সময় সেনাবাহিনীর জন্য কতজন যুবক পাওয়া যাবে। বরং সেই আদমশুমারি কেবল এজন্য ছিল যেন প্রত্যেক ব্যক্তিকে খাদ্য ও বস্ত্র দেওয়া যায়। নিঃসন্দেহে মহানবী (স.)-এর যুগেও একটি আদমশুমারি হয়েছিল। কিন্তু তখনও মুসলমানরা রাষ্ট্রক্ষমতা লাভ করেনি। এজন্য সেই আদমশুমা রির উদ্দেশ্য ছিল কেবল মুসলমানদের সংখ্যা নির্ণয় করা। ইসলামী রাষ্ট্রে সর্বপ্রথম আদমশুমা রি হযরত উমর (রা.)'র যুগেই হয়েছিল এবং সেটি রাষ্ট্রের প্রত্যেক ব্যক্তির খাদ্য ও বস্ত্রের অধিকার সুনিশ্চিত করার জন্য হয়েছিল। এটি কত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যার মাধ্যমে পুরো পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। কেবল এটি বলে দেওয়া যে, আবেদন কর, বিবেচনা করা হবে। আবেদনপত্র জমা দিতে বলা হবে এরপর ভেবে দেখা হবে! এটি সব মানুষের আত্মাভিমান সহ্য করতে পারে না। এজন্য ইসলাম এ নীতি নির্ধারণ করেছে যে, খাদ্য ও বস্ত্রের দায়িত্ব রাষ্ট্রের এবং এটি ধনী-দরিদ্র সবাইকেই দেয়া হবে; সে কোটিপতিই হোক না কেন, সে তা অন্য কাউকে দিয়ে দিক না কেন, যেন কেউ এটি মনে না করে যে, তাকে তুচ্ছজ্ঞান করা হয়। (তফসীর কবীর, ১০ম খণ্ড, পৃ: ৩০৮)

যখন ধনীরা পাবে, তারা যদি তাক্বওয়াশীল হয় তবে তারা তা নিজে খরচ না করে অভাবীদের দিয়ে দিবে।

হযরত উমর (রা.)'র যুগে রাজ্যগুলোকে বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত করা হয়েছে। ২০ হিজরীতে হযরত উমর (রা.) রাজ্যগুলোকে আটটি প্রদেশে বিভক্ত করেন যেন প্রশাসনিক কাজে সুবিধা হয়। ১ম মক্কা, ২য় মদীনা, ৩য় সিরিয়া, ৪র্থ জাযিরা, ৫ম বসরা, ৬ষ্ঠ কূফা, ৭ম মিসর ও ৮ম ফিলিস্তিন।

(আল ফারুক, প্রণেতা- শিবলি নুমানি, পৃ: ১৮৫)

এরপর তাঁর যুগেই শূরার প্রচলন হয়। মজলিসে শূরাতে সর্বদা বাধ্যতামূলকভাবে সে দু'টি দল অর্থাৎ মুহাজির ও আনসারদের কর্মকর্তাগণ অংশ নিতেন। আনসারগণও দু'টি গোত্রে বিভক্ত ছিলেন, অওস ও খাযরায। অতএব, এ দু 'টি গোত্রেরই মজলিসে শূরায়অংশ নেওয়া আবশ্যক ছিল। এই মজলিসে শূরায় হযরত উসমান (রা.), হযরত আলী (রা.), হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ (রা.), হযরত মু'আয বিন জাবাল (রা.), হযরত উবাই বিন কা'ব (রা.), হযরত যায়েদ বিন সাবেত (রা.) অংশগ্রহণ করতেন। মজলিসেশূরা অনুষ্ঠানের যে রীতি ছিল তা হল, প্রথমে একজন ঘোষণাকারী 'আস্ সালাতু জামে' বলে ঘোষণা দিত, অর্থাৎ সকলে নামযের জন্য একত্রিত হয়ে যাও। যখন লোকেরা সমবেত হতো তখন হযরত উমর (রা.) মসজিদে নববীতে গিয়ে দু'রাকাত নামায আদায় করতেন। নামায শেষে মিম্বরে আরোহণ করে খুতবা দিতেন এবং আলোচনা সাপেক্ষ্য বিষয়াদি উপস্থাপন করা হত। উক্ত বিষয়ে পর্যালোচনা হত। সাধারণ এবং দৈনন্দিন বিষয়াদি (নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে) উক্ত মজলিসের সিদ্ধান্ত যথেষ্ট মনে করা হত কিন্তু যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থাপিত হতো সেক্ষেত্রে মুহাজির এবং আনসারের 'ইজলাসে আম' বসত এবং সবার ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে সেই বিষয় নিষ্পত্তি হতো। সৈন্যদের বেতন, দফতরের কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ, কর্মকর্তা নিয়োগ, ভিনদেশীদের ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাধীনতা এবং তাদের ওপর করের হার নির্ধারণ- মোটকথা বহু বিষয় শূরায় উপস্থাপিত হয়ে নিষ্পত্তি হত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিলে মজলিসে শূরার ইজলাস বসত। এছাড়া আরও একটি মজলিস ছিল, সেখানে দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত এবং প্রয়োজনীয় বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা হত। এই মজলিস সর্বদা মসজিদে নববীতে অনুষ্ঠিত হত এবং কেবলমাত্র মুহাজির ও অন্যান্য সাহাবী এতে যোগদান করতেন। বিভিন্ন প্রদেশ এবং জেলাসমূহের দৈনন্দিন খবরাখবর যা খিলাফতের দরবারে পৌঁছত, হযরত উমর (রা.) সেই মজলিসে তা বর্ণনা করতেন এবং কোন আলোচনাযোগ্য বিষয় থাকলে এ বিষয়ে মানুষের মতামত নেওয়া হতো। মজলিসে শূরার সদস্যগণ ছাড়াও সাধারণ প্রজাদেরও ব্যবস্থাপনার বিষয়ে মতামত প্রকাশ করার অনুমতি ছিল। বিভিন্ন প্রদেশ এবং জেলাসমূহের শাসক সাধারণত প্রজাদের ইচ্ছানুযায়ী নিযুক্ত করা হতো বরং কোন কোন সময় পুরো নির্বাচনী পদ্ধতির মাধ্যমে এই প্রক্রিয়া সম্পাদন করা হত। কূফা, বসরা এবং সিরিয়ায় যখন খাজনা আদায়কারী নিযুক্ত করা শুরু হয় তখন হযরত উমর (রা.) উক্ত তিন প্রদেশে নির্দেশনা প্রেরণ করেন যে, স্থানীয়রা নিজ নিজ পছন্দ অনুযায়ী এক একজন ব্যক্তি মনোনীত করে যেন প্রেরণ করে যারা তাদের কাছে সমস্ত লোকের চেয়ে অধিক সৎ এবং যোগ্য। (আল ফারুক, প্রণেতা- শিবলি নুমানি, পৃ: ১৮০-১৮২)

হযরত উমর (রা.) কীভাবে কর্মকর্তা মনোনয়ন দিতেন, তাদের জন্য কী কী নির্দেশনা দিতেন, কীভাবে দিতেন- এ বিষয়ে লেখা আছে যে, 'গুরুত্বপূর্ণ সেবা প্রদানের জন্য কর্মকর্তা নিযুক্ত হতো শূরার মাধ্যমে। যে ব্যক্তির বিষয়ে সকল শূরা সদস্য ঐক্যমত্য পোষণ করতেন, তাকে মনোনয়ন দেওয়া হত। অনেক ক্ষেত্রে প্রদেশ বা জেলার শাসককে আদেশ দিয়ে পাঠাতেন যে, যে ব্যক্তি অধিক যোগ্য, তাকে মনোনীত করে পাঠাও। অতএব, ঐসব নির্বাচিত লোককে হযরত উমর (রা.) কর্মকর্তা নিযুক্ত করতেন। হযরত উমর (রা.) কর্মকর্তাদের জন্য অধিক ভাতা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। এতে অনেক বড় প্রজ্ঞা নিহীত আছে যে, তারা যেন সততার সাথে নিজেদের দায়িত্ব সম্পাদন করতে পারে, জাগতিক কোন লোভ-লালসা যেন না থাকে। হযরত উমর (রা.) কর্মকর্তাদের এই উপদেশ দিতেন যে, স্মরণ রাখবে! আমি তোমাদেরকে শাসক ও কঠোরতা প্রদর্শনের জন্য প্রেরণ করি নি বরং ইমাম বানিয়ে প্রেরণ করেছি যেন লোকেরা তোমাদের অনুগামী হয়। মুলমানদের অধিকার প্রদান করবে। তাদের লাঞ্ছিত করার উদ্দেশ্যে প্রহার করবে না। শাস্তি দিবে না বরং তাদের অধিকার প্রদানে সচেষ্ট থাকবে। অযথা কারো প্রশংসা করবে না পাছে সে পরীক্ষায় নিপতিত হয়। তাদের জন্য সর্বদা নিজেদের দ্বার রুদ্ধ রাখবে না পাছে শক্তিধর দুর্বলদের গ্রাস করে বসে। নিজেকে কারো ওপর প্রাধান্য দিবে না পাছে তার প্রতি অন্যায় হয়। যে ব্যক্তি কর্মকর্তা নির্বাচিত হত, তার কাছ থেকে এই অঙ্গীকার নেওয়া হত যে, সে তুর্কী ঘোড়ায় আরোহণ করবে না, মিহি (সুতার) কাপড় পরিধান করবে না, মিহি আটা খাবে না, দরজায় প্রহরী রাখবে না, অভাবীদের জন্য সদা দ্বারা খোলা রাখবে। সকল কর্মকর্তার জন্য এসব দিকনির্দেশনা প্রণীত হয় এবং জনসম্মুখে তা পাঠ করে শোনানো হত। কর্মকর্তা নির্বাচন করার পর তাদের সহায় সম্পত্তির হিসাব নেওয়া হত। কোন কর্মকর্তার আর্থিক অবস্থায় অস্বাভাবিক প্রবৃদ্ধি হলে সে যদি যথাযথ সদুত্তর দিতে না পারত তাহলে সে শাস্তির সম্মুখীন হত এবং অতিরিক্ত সম্পদ বায়তুল মালে জমা করা হত। কর্মকর্তাদের জন্য নির্দেশ ছিল যে, হজ্জের সময় যেন আবশ্যকীয়ভাবে সবাই একত্রিত হয়। সেখানে গণআদালত বসত, যেখানে কোন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কারো অভিযোগ থাকলে তাৎক্ষণিক সুরাহা করা হত। কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ পর্যালোচনার জন্য বয়োজ্যেষ্ঠ সাহাবীদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠিত ছিল যাঁরা বিচার-বিশ্লেষণের জন্য যেতেন আর অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হলে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হত।

(আল ফারুক, প্রণেতা- শিবলি নুমানি, পৃ: ১৮৯-১৯৩)

কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সম্পর্কে হযরত উমর (রা.)'র দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল তা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেন, হযরত উমর (রা.)'র ঘটনা। কূফাবাসী খুবই বিদ্রোহী স্বভাবের ছিল। তারা সর্বদা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে এই বলে অভিযোগ করতে থাকত যে, অমুক কাযী এমন, অমুকের মাঝে এই দুর্বলতা রয়েছে তো তমুকের মাঝে এই। হযরত উমর (রা.) তাদের অভিযোগ শুনে শাসক পরিবর্তন করে দিতেন এবং অন্য কর্মকর্তা নিযুক্ত করে প্রেরণ করতেন অর্থাৎ পরিবর্তন করে অন্য কোন কর্মকর্তা নিযুক্ত করে পাঠাতেন। কেউ কেউ হযরত উমর (রা.)-কে এ-ও বলে যে, এই পদ্ধতি সঠিক নয় কেননা আপনি এভাবে কর্মকর্তা পরিবর্তন করতে থাকলে তারা তাদের অভিযোগ অব্যাহত রাখবে। তাই আপনি কর্মকর্তা পরিবর্তন করবেন না, কিন্তু হযরত উমর (রা.) বলেন, আমি কর্মকর্তা পরিবর্তন করতে থাকবো যতক্ষণ না কূফাবাসী নিজেরাই ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়ে। এভাবে এককাল পর্যন্ত যখন তাদের পক্ষ থেকে অভিযোগ আসতে থাকে তখন হযরত উমর (রা.) বলেন, এবার আমি কূফাবাসীদের জন্য এমন এক গভর্নর নিযুক্ত করবো যে তাদেরকে সোজা করে ছাড়বে। সেই গভর্নর ছিল ১৯ বছর বয়স্ক এক যুবক যাকে হযরত উমর (রা.) তাদের সোজা করার জন্য প্রেরণ করেছিলেন। ১৯ বছর বয়স্ক সেই যুবকের নাম ছিল আব্দুর রহমান বিন আবী লায়লা। কূফাবাসী যখন জানতে পারে যে, ১৯ বছর বয়সী এক ছোকরা তাদের গভর্নর নিযুক্ত হয়ে এসেছে তখন তারা বলে, আস! আমরা সবাই মিলে তার সাথে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করি। কূফাবাসী দুষ্ট তো ছিলই অধিকন্তু তারা বড় বড় জোব্বাধারী লোকদের যাদের বয়স

৭০-৮০ কিংবা ৯০ বছর ছিল, একত্রিত করে এবং ফন্দি আঁটে, বৃদ্ধদের সাথে শহরের সবাই আব্দুর রহমান-কে স্বাগত জানাতে যাবে এবং রসিকতার ছলে তাকে জিজ্ঞেস করবে, জনাব! আপনার বয়স কত অর্থাৎ তার কাছে বয়স জানতে চাইবে। সে যখন উত্তর দিবে তখন আমরা সবাই মিলে হাসি-ঠাট্টা ও তিরস্কার করে বলবো, এই ছোকরা আমাদের গভর্নর হয়ে এসেছে! অতএব, পরিকল্পনা মাফিক তারা তাকে স্বাগত জানাতে শহর থেকে ২-৩ মাইল দূরে আসে। ততক্ষণে গাধার পিঠে চড়ে আব্দুর রহমান বিন আবী লায়লা-ও পৌঁছে যান। কূফার সব মানুষ সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। সামনের সারিতে বৃদ্ধ সর্দাররা ছিল। আব্দুর রহমান বিন আবী লায়লা যখন নিকটে এসে পৌঁছে তখন তারা জিজ্ঞাসা করে, আপনিই কি আমাদের গভর্নর হিসেবে এসেছেন এবং আপনার নাম কি আব্দুর রহমান? তিনি বলেন, হ্যাঁ। তখন তাদের একান্ত বয়োবৃদ্ধ এক ব্যক্তি এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, জনাব! আপনার বয়স কত? আব্দুর রহমান উত্তরে বলেন, আমার বয়সের ধারণা এভাবে করতে পার, মহানবী (সা.) যখন হযরত উসামাহ্ বিন যায়েদ (রা.)-কে ১০ হাজার সাহাবীর সেনাপতি নিযুক্ত করে প্রেরণ করেছিলেন যাদের মাঝে হযরত আবু বকর (রা.) ও হযরত উমর (রা.)ও ছিলেন, তখন হযরত উসামাহ্ বিন যায়েদ (রা.) 'র বয়স যা ছিল আমার বয়স তার চেয়ে এক বছর বেশি। একথা শোনার সাথে সাথে কুয়াশা পড়লে যেমনটি হয় তারা সেভাবে লজ্জিত হয়ে পিছিয়ে যায় আর তারা পরস্পর বলাবলি করতে থাকে, এই ছেলে যতদিন এখানে আছে সাবধান! কেউ কথা বলবে না নতুবা সে তোমাদের চামড়া তুলে ফেলবে। তিনি সেখানে দীর্ঘদিন গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং কূফাবাসী তার সামনে মুখ খুলতে পারত না।

(খুতবাতে মাহমুদ, খণ্ড-২৩, পৃ: ২২২-২২৩)

অতঃপর রয়েছে যাকাত সংগ্রহের ব্যবস্থাপনা। হযরত উমর (রা.) ইরাক এবং সিরিয়া বিজয়ের পর খাজনা সংক্রান্ত নিয়মনীতির প্রতি দৃষ্টি দেন। রাজা-বাদশাহ্রা যেসব জমি স্থানীয় জনগণের কাছ থেকে জোর করে ছিনিয়ে নিয়ে রাজ কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের দিয়েছিল তা তিনি তাদেরকে ফিরিয়ে দেন আর একইসাথে হযরত উমর (রা.) এই আদেশ জারি করেন, যেসব আরব এ দেশে বিস্তার লাভ করেছে তারা কৃষিকাজ করবে না অর্থাৎ আরবের অধিবাসীরা কৃষিকাজ করবে না। এই আদেশের একটি উপকারী দিক ছিল আর তা হল, কৃষিকাজ সম্পর্কে স্থানীয় লোকদের যে অভিজ্ঞতা ছিল, আরবরা উক্ত বিষয়ে অনবহিত ছিল। প্রত্যেক স্থানীয় অঞ্চলের কৃষিকাজের রীতি ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। তাই এই নির্দেশ ছিল যে, বহিরাগতরা কৃষিকাজ করবে না বরং স্থানীয়রাই কৃষিকাজ করবে।

লোকদের কাছ থেকে পূর্বে বলপ্রয়োগ পূর্বক খাজনা আদায় করা হত। হযরত উমর (রা.) খাজনার নিয়ম -নীতি নির্ধারণ করার পর খাজনা আদায়ের পদ্ধতিও অনেক সহজ করে দেন এবং নয়া পদ্ধতি চালু করেন। যিম্মীদের (অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাসকারী বিধর্মী প্রজাদের) প্রতি অনেক বেশি যত্নবান ছিলেন। খাজনা আদায় করার সময় রীতিমত জিজ্ঞেস করতেন যে, কারো প্রতি অন্যায় করা হয় নি তো। পারসী ও খ্রিস্টান যেসব বিধর্মী প্রজা ছিল তাদের কাছে পরামর্শ চাইতেন এবং তাদের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

কৃষির উন্নয়নে হযরত উমর (রা.) অনাবাদি জমি সম্পর্কে বলেন, যে এতে চাষাবাদ করবে সে এর মালিকানা স্বত্ব লাভ করবে। এজন্য তিন বছর সময় নির্ধারণ করা হয়। খাল খনন করা হয়। সেচ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়, যারা পুকুর ইত্যাদি খনন করার কাজও করতো।

(আল ফারুক, প্রণেতা- শিবলি নুমানি, পৃ: ১৯৮,২০২,২০৭,২০৮)

কৃষির উন্নয়নে এই ছিল তাঁর (রা.) পদক্ষেপ। এ হল হযরত উমর (রা.) 'র গুটিকয়েক কাজ যা আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করলাম। তাঁর (রা.) স্মৃতিচারণ অব্যাহত আছে, বাদবাকী আগামীতে বর্ণনা করব, ইনশাআল্লাহ্।

(এখন) আমি একটি ঘোষণা দিতে চাই, তা হল, আহমদীয়া এনসাইক্লোপিডিয়া বানানো হয়েছে, আজ এর উদ্বোধন করা হবে। কেন্দ্রীয় আর্কাইভ এবং রিসার্চ সেন্টার এটি প্রস্তুত করেছে। কিছুদিন পূর্বে তারা এই কাজের সূচনা করেছিলেন আর এখন আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় এই ওয়েব সাইট জামা'তের সদস্যদের জন্য অন লাইনে দেওয়া হচ্ছে। এর ঠিকানা হচ্ছে, www.ahmadipedia.org। যাতে Home Page -এ একটি সার্চ ইঞ্জিন এর সহায়তায় বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত খুঁজে বের করার জন্য সুযোগ থাকবে। এটি খুবই পাঠক-বান্ধব ও ব্যবহারের জন্য সহজ করা হয়েছে। জামাতের বই-পুস্তক, বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ, ঘটনাবলী, ধর্মবিশ্বাস এবং (জামাতের) স্থাপনাসমূহের বরাতে মৌলিক তথ্যাদি সরবরাহ করা হয়েছে। প্রত্যেক এন্ট্রির সাথে সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট, ভিডিও এবং জামাতী পত্র-পত্রিকায় (প্রকাশিত) প্রবন্ধাদির লিংক সরবরাহ করা হয়েছে, যাতে এসব মাধ্যম থেকে বিস্তারিত তথ্য ও উপাত্ত পাওয়া যায়। বিস্তারিত জানার জন্য প্রদত্ত লিংকগুলোর একটি উপকারিতা এটিও হবে যে, আহমদীয়া জামাতের অন্যান্য ওয়েব সাইট এর সাথেও পাঠকরা যুক্ত হতে পারবে আর তারা সকল পত্র-পত্রিকা থেকে উপকৃত হতে পারবে। বিশ্বময় বিস্তৃত জামাতের সদস্যদের কাছে অনেক মূল্যবান তথ্য-উপাত্ত রয়েছে, যা (জামাতের) কোথাও রেকর্ডে বা সংরক্ষিত নেই। আহমদীপিডিয়া ওয়েবসাইটে Contribution নামেও একটি অপশন দেওয়া হয়েছে, যেখানে পাঠকরা যে কোন বিষয়ে নিজেদের বিভিন্ন তথ্য-উপাত্ত, সাক্ষ্যপ্রমাণ ও পাণ্ডুলিপি সরবরাহ করতে পারবেন। এমন নয় যে, তারা নিজেই আপলোড করবেন বরং ব্যবস্থাপনাকে সরবরাহ করবেন। সরবরাহকৃত তথ্যাদি যাচাই-বাছাই ও সত্যায়নের পর সেগুলোকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অধীনে যুক্ত করে দেওয়া হবে। এভাবে এই ওয়েবসাইটটি পুরো জামাতের সহযোগিতায় একটি চলমান স্থায়ী প্রজেক্টে রূপান্তরিত হবে আর প্রত্যেক আহমদীর জন্য কল্যাণকর প্রমাণিত হবে, ইনশাআল্লাহ্।

কেউ যদি ওয়েবসাইটে কোন কাঙ্ক্ষিত তথ্য (খুঁজে) না পায় তাহলে তিনি আহমদী পিডিয়ার (ব্যবস্থাপনার) সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন এরপর তারা ওয়েবসাইটে প্রার্থিত তথ্য সরবরাহ করার ব্যবস্থা করবে। অতঃপর এরা বলছে যে, যদিও এসব তথ্য-উপাত্ত নির্ভরযোগ্য ও সত্যায়িত সূত্রে সরবরাহ করা হয়েছে কিন্তু এরপরও যদি কোন পাঠক বা ভিজিটরের কাছে এমন সাক্ষ্য বা প্রমাণ থাকে যা কোন তথ্যের বিপরীত হয় তাহলে আমাদের কাছে এমন প্রমাণ প্রেরণ করুন, যাতে গবেষণা বা যাচাই-বাছাইয়ের পর জামাতের ইতিহাসকে ষোলআনা নির্ভরযোগ্য হিসেবে সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করা যায়।

এই ওয়েবসাইট প্রস্তুতির জন্য অত্যন্ত সুন্দরভাবে সকল টেকনিক্যাল দায়িত্ব পালন করেছে কেন্দ্রীয় আইটি বিভাগ আর এই কাজ সম্পাদনের লক্ষ্যে আইটি বিভাগ অনেক পরিশ্রম করেছে, যাতে তাদের নিয়মিত কর্মীবৃন্দ ছাড়া স্বেচ্ছাসেবীরাও রয়েছে। তথ্য-উপাত্ত প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় আর্কাইভ বিভাগের মুরব্বীগণ ও স্বেচ্ছাসেবীরা নিরলস পরিশ্রম করেছে। এছাড়া সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত উর্দু থেকে অনুবাদ করে তা আপলোড করা, মোটকথা সকল কাজ সম্পাদনে অক্লান্ত পরিশ্রম করে সবাই কাজ করেছে। এই ওয়েবসাইট প্রস্তুত করার নেপথ্যে যারা কাজ করেছেন আল্লাহ্ তাদের সবাইকে উত্তম পুরস্কার দিন। জুমুআর নামাযের পর আজ এই (ওয়েবসাইটের) শুভ উদ্বোধন করবো, ইনশাআল্লাহ্।

****

অনেক পাপ আছে সন্তানদের ভালবাসার পরিণামেও জন্ম নেয়। হযরত ইব্রাহিম আমাদের এই পাঠ দিয়েছেন যে, সন্তানের ভালবাসা সেই সীমা পর্যন্ত হওয়া উচিত, যতটুকু ভালবাসায় সে বিগড়ে যায় না। সন্তানের ভালবাসার উপর খোদা তা'লার ভালবাসাকে আমাদের প্রাধান্য দেওয়া উচিত, কেননা এটি শুধু খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের কারণই নয়, সন্তানের সুরক্ষার মাধ্যমও বটে।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) সূরা ইব্রাহিমের ৩৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-

ঐশী প্রেম কতই না পবিত্র দৃষ্টান্ত! হযরত ইব্রাহিম (আ.) বলেন,'আমার সন্তানেরা যদি শিরক না করে, তবেই তারা আমার সন্তান,নচেত নয়। এই আয়াত দ্বারা এও প্রমাণ হয় যে অনেক পাপ আছে সন্তানদের ভালবাসার পরিণামেও জন্ম নেয়। হযরত ইব্রাহিম আমাদের এই পাঠ দিয়েছেন যে, সন্তানের ভালবাসা সেই সীমা পর্যন্ত হওয়া উচিত, যতটুকু ভালবাসায় সে বিগড়ে যায় না। যে ভালবাসা সন্তানকে নষ্ট করে দেয়, তা ভালবাসা নয়, শত্রুতা। দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দের তুলনায় আত্মিক ও নৈতিক সংশোধনের ভাবনা অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত। যদি চেষ্টা সত্ত্বেও সন্তানের সংশোধন না হয়, তবে এমন এক সময় আসতে পারে যখন সন্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা আবশ্যক হয়ে পড়ে। কেননা, যখন তারা দেখে যে মা-বাবা তাদের দোষত্রুটি উপেক্ষা করছে, তখন তারা বিপথে চালিত হয়। কিন্তু যখন জানা থাকে যে তাদের দোষত্রুটির উপযুক্ত শাস্তি তারা পাবে, তখন ক্রমেই তাদের সংশোধন হয়ে যায়। এই কারণে সন্তানের ভালবাসার উপর খোদা তা'লার ভালবাসাকে আমাদের প্রাধান্য দেওয়া উচিত, কেননা এটি শুধু খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের কারণই নয়, সন্তানের সুরক্ষার মাধ্যমও বটে।

প্রথমে বলেছিলেন, 'আমার সন্তানদের মধ্যে কেউ যদি শিরকে লিপ্ত হয়, তবে সে আমার সন্তান নয়।' কিন্তু নবীর মধ্যে দয়ার বৈশিষ্ট্যও থাকে। সন্তানকে সন্তান মনে না করা এবং খোদার ভালবাসাকে প্রাধান্য দেওয়া ভিন্ন বিষয় আর তাদের জন্য খোদার নিকট কৃপার আবেদন করা ভিন্ন বিষয়। অতএব হযরত ইব্রাহিম (আ.) দোয়া করছেন, 'প্রথমত আমার সন্তানকে শিরক থেকে রক্ষা কর। কিন্তু তাদের মধ্যে যদি কেউ আমার পথের বিরুদ্ধে যায়, তবে আমি তাকে একথাই বলব যে, সে আমার সন্তান নয়। কিন্তু যেহেতু তুমি ক্ষমাশীল ও কৃপাশীল, তাই আমি এই আশা করি যে তুমি তাদের পাপ ক্ষমা করে দিবে এবং তাদের উন্নতির উপকরণ সৃষ্টি করবে।' এই আয়াতে বলা হয়েছে যে সন্তানের প্রতি অসন্তুষ্টির অর্থ এই নয় যে অন্তরকেও পাষাণ করে নিতে হবে। বরং শাস্তি বাহ্যিক হোক, কিন্তু মনে মনে তাদের জন্য যেন দোয়া করতে থাকে আর তাদের সংশোধনই যেন দৃষ্টিতে থাকে, তাদের ধ্বংস কামনা যেন না করে।

(তফসীর কবীর, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৪৮৪)

চলেছে।

একজন অতিথি প্রশ্ন করেন যে, আমাদের দেশ মেসেডোনিয়ার জন্য জামাতের পরিকল্পনা কি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: মেসেডোনিয়া যদি স্বাধীনভাবে কাজ করতে দেয় তবে আমরা কাজ করব আর সেখানে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার বাণী প্রচার করব আর দেখাব যে কিভাবে সকল ধর্ম ঐক্যবদ্ধ হতে পারে এবং কিভাবে পারস্পরিক ভালবাসা, শান্তি ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করা যেতে পারে।

একজন অতিথি প্রশ্ন করেন, কেউ যদি পুণ্যকর্ম করে, কিন্তু খোদার ইবাদত না করে, তবে সে কি তার প্রতিদান পাবে?

হুযুর আনোয়ার বলেন: আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে ইবাদতকেই মানুষের সৃষ্টির উদ্দেশ্য হিসেবে বর্ণনা করেছেন। 'ওয়ামা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা লি ইয়াবুদুন।' অর্থাৎ আমি জিন ও মানুষকে কেবল আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছি। কাজেই ইবাদত করা আবশ্যক। যে ব্যক্তি ইবাদতও করবে আর সেই সঙ্গে পুণ্যকর্মও করবে, সে অন্যদের তুলনায়, যারা কেবল পুণ্যকর্ম করে, উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হবে। যেমন বিজয় মঞ্চ হয়, কেউ প্রথম স্থানে দাঁড় হয়, কেউ দ্বিতীয় স্থানে আবার কেউ তৃতীয় স্থানে দাঁড় হয়। তাছাড়া প্রতিদান দেওয়ার কাজ আল্লাহ্‌র, তিনি যাকে চান দিতে পারেন।

নিকোলচি গোশিওসকি নামে এক সরকারি কর্মকর্তা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন, 'ধর্মকে জানা এবং সেই সঙ্গে এ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার দৃষ্টিকোণ থেকে আমার এখানে আসা বেশ ভাল পদক্ষেপ ছিল। জলসার বক্তব্যগুলি আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছে। হুযুরের ভাষণগুলি ইসলামসম্পর্কে আমার চিন্তাধারা সম্পূর্ণরূপে পাল্টে ফেলেছে। এর আগে আমি ইসলামকে একটি কট্টর ও উগ্রবাদী ধর্ম হিসেবে দেখতাম। এখন আমি নিজের পুরোনো চিন্তাধারা পাল্টে ফেলেছি। ইসলাম তো শান্তির প্রচারক ধর্ম।

একটি প্রাইভেট ফার্মের পরিচালক নিজের ভাবাবেগ ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, 'এখানে জলসা বক্তব্য উপস্থাপনা, মানুষের সঙ্গে মেলামেশা এবং সমবেত প্রার্থনার প্রভাব আমাকে ইসলামী অনুষ্ঠানাদি, ঐতিহ্য এবং এই ধর্মটি সম্পর্কে জানার বিষয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে। আমাকে সব থেকে বেশি প্রভাবিত করেছে হুযুর আনোয়ারের বক্তব্য। আমি আগামী বছরও পূর্ণ উদ্যমে জলসায় অংশগ্রহণ করতে চাইব।

হযরত খলীফাতুল মসীহর সঙ্গে সাক্ষাতের সময় আমি কয়েকটি প্রশ্নও করেছি। খলীফা প্রত্যেক সেই বিষয়কে স্পষ্ট করে বুঝিয়েছেন যা আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তাঁর উত্তর শুনে ইসলাম সম্পর্কে আমার চিন্তাধারা পাল্টে গিয়েছে। হুযুরের উত্তর অত্যন্ত দার্শনিকসুলভ ছিল, তাঁর কথার মধ্যে সত্য ছিল। আমি জানতে পেরেছি যে ইসলাম ধর্মের শিক্ষা কতটা ভাল,যা সকলকে শান্তি ও ভালবাসার শিক্ষা দেয়। আমাদের সকলকে অত্যন্ত যত্নে রাখা হয়েছিল, আমাদের সম্পর্ক এমন সব লোকদের সঙ্গে হয়েছিল, যাদেরকে আমরা চিনতাম না। কিন্তু মনে হল যেন তারা আমাদেরকে চিরকালই চেনে। আমি মনে করি, এই উচ্চ মানদণ্ড প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীদের কাছেও থাকা উচিত।

এক ভদ্রমহিলা বলেন: জলসায় এই নিয়ে আমার দুইবার আসা হল। ইসলাম এবং এর শিক্ষা সম্পর্কে আমার চিন্তাধারা একেবারেই পাল্টে গিয়েছে। জলসায় কর্মরত ব্যক্তিদের দেখে, তাদের আচার আচরণ দেখে আমি যারপরনায় অবাক হয়েছি। জলসা আমাকে যে বার্তা দিয়েছে, তা আমার মধ্যে 'সকলের তরে ভালবাসা, কারো তরে ঘৃণা নয়'- এর বোধোদয় ঘটিয়েছে। খলীফাতুল মসীহর ভাষণ ইসলাম সম্পর্কে আমাদের চিন্তাধারা সম্পূর্ণ রূপে পাল্টে দিয়েছে।

মেসেডোনিয়া থেকে আগত আরও এক অতিথি বলেন: আমি আত্মার গভীর পর্যন্ত আনন্দিত এবং আশ্বস্ত। বিশেষ করে খলীফাতুল মসীহর বক্তব্যর বিষয়ে আমি বলতে পারি যে, তিনি আমাদেরকে শান্তি, সহনশীলতা এবং ভালবাসার দিকে আহ্বান করেছেন। আমরা সকলে অবগত আছি যে, আমরা এমন এক কালের মধ্যে জীবন অতিবাহিত করছি, যখন কিনা সহনশীলতার মাত্রা শূন্যে নেমে এসেছে আর চারিদিকে যুদ্ধ হচ্ছে, মানুষ মারা যাচ্ছে। এই জলসা সালানা আমাদের উদ্দেশ্যে বার্তা দেয়, সেই সব রোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন। আমি দোয়া করি, এই জলসা সকল ঈমান আনয়নকারীদের জন্য প্রেমের প্রসারের জন্য পথ প্রদর্শনকারী হোক। কেননা খোদা তা'লা হলেন ভালবাসার প্রতীক। আমার বাসনা, এই ধরণের সভা আরও বেশি করে হোক, যা ভালবাসার দূর দূরান্তে পৌঁছে দিবে। যারা ভালবাসার প্রসারকারী,তারা পরকালে ভালবাসাই পেয়ে থাকে।

ইতিহাসের অধ্যাপক শাসকো ক্রোশোসভিকি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেন-

'এই জলসায় খলীফাতুল মসীহর ভাষণ শুনে আমি ইসলাম সম্পর্কে অনেক জেনেছি। আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ। কাল আমি হুযুরের কাছেই ছিলাম। আমাদের এই সাক্ষাত অনন্য ও অসাধারণ ছিল। আর এরফলে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছে। আমাদেরকে অনেক সময় দেওয়ার জন্য হুযুর আনোয়ারকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এই বৈঠকে আমরা হুযুর আনোয়ারকে কিছু প্রশ্নকরেছি।

হুযুর আনোয়ার বিস্তারিতভাবে আমাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। আহমদীয়াতসম্পর্কে আমরা নতুন নতুন বিষয় শুনেছি। আর আমি জানতে পেরেছি যে, আহমদীরা যা বলে তা কাজেও করে দেখায়।

মেসেডোনিয়া থেকে তথ্য প্রযুক্তি কোর্সের শেষ বছরের এক ছাত্রী নিজের মতামত ব্যক্ত করে বলেন-

আমি প্রথমবার জলসায় অংশগ্রহণ করছি। এমন সুবিশাল আয়োজন দেখে আমি অভিভূত। এছাড়াও খলীফাতুল মসীহর সঙ্গে আমাদের যে সাক্ষাত হয় সেটি আমার জন্য এক নতুন প্রকারের অভিজ্ঞতা ছিল। জামাত আহমদীয়াকে আরও ভালভাবে বোঝার জন্য এই সাক্ষাত আমাকে সহায়তা করেছে। হুযুর আনোয়ার আমাদের প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর অনায়াসে দিয়েছেন। এই সাক্ষাতটি আমাদের সকলের মধ্যে প্রবল উৎসাহের সঞ্চার করেছে। এরপর আমরা মহিলারা হুযুর আনোয়ারে সহধর্মিণীর সঙ্গে সাক্ষাত করি। আমরা তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে জানতে চেষ্টা করি যে কিভাবে তিনি এমন এক ব্যক্তির স্ত্রী হলেন যার জীবন ভীষণ ব্যস্ততার মধ্যে কাটে? আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে হুযুর যখন ব্যস্ত থাকেন না, তখন বাড়িতে তাঁর জীবন একজন সাধারণ মানুষের মতই। হুযুরের বেগম সাহেবা আমাদেরকে বিবাহ প্রসঙ্গে বলেন যে কিভাবে আমরা নিজেদের জীবনসঙ্গী নির্বাচন করব। আমি আনন্দিত যে তিনি অত্যন্ত বিশদে আমাদের সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। সব শেষে আমি বলতে চাইব যে, এই জলসায় আমি ভীষণ আশ্বস্ত ছিলাম আর আমি বহু নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি। আর পুনরায় জলসায় অংশগ্রহণ করতে চাইব।

লিথোনিয়া থেকে আসা অতিথি তথা ছাত্র ও প্রফেসরদের সঙ্গে হুযুরের সাক্ষাত এবং প্রশ্নোত্তর।

একজন ছাত্র ভারতীয় সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করছেন আর একজন ছাত্রী চাইনিজ সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করছেন। তারা জানায় যে পুরুষ ও মহিলা উভয় অংশে তারা জলসায় উপস্থিত থেকেছে। উভয় দিকের পরিবেশ অত্যন্ত শান্তি ও স্বস্তিদায়ক ছিল। এত বড় জন সমাবেশ, কোথাও কোন ঝগড়া বিবাদ নেই, কেবলই ভালবাসা- এটি আমাদের জন্য কর্ম আশ্চর্যের ছিল না।

হুযুর আনোয়ার একজন ছাত্রকে বলেন, তুমি নিজের ডিগ্রি নেওয়ার পর জামাত আহমদীয়ার উপরও গবেষণা কর। ভারতে গেলে অবশ্যই কাদিয়ান যেও, যেখান থেকে জামাতের উৎপত্তি হয়েছে।

একজন ছাত্র প্রশ্ন করেন যে, খলীফা অসম্ভব ব্যস্ত থাকেন। আপনি কিভাবে নিজের সব কাজ ম্যানেজ করেন।

হুযুর আনেয়ার বলেন: আমি প্রত্যহ সাত=আট ঘন্টা চিঠি পড়ি। অনেক চিঠি আমি স্টাফদেরকে চিঠির সারমর্ম তৈরীর দেওয়ার জন্য দিয়ে দিই। এরপর সেই সার-সংক্ষেপগুলোও দেখি। অনুরূপভাবে নিজের স্বাক্ষর সহকারে প্রতিদিন ছয়-সাতশ চিঠির উত্তর দিই। আমি জানি না কিভাবে এত কাজ হয়ে ওঠে। খোদা তা'লাই সাহায্য করেন। আর যতদূর লেখার প্রশ্ন, আমি প্রতিদিন সাড়ে তিন হাজার থেকে চার হাজার শব্দ লিখে ফেলি।

একজন ছাত্র নিজের আবেগ অনুভুতির কথা জানিয়ে বলেন, এই জলসা পশ্চিমের সেই সব চিন্তাবিদদের জন্য অত্যন্ত উপযোগী যারা ইসলাম সম্পর্কে খুব কম জানেন অথবা নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করেন। কেননা এই জলসা তাদের আবদ্ধ চিন্তাধারাকে ব্যপকতা দিতে পারে। আপনারা অত্যন্ত ইতিবাচক চিন্তাধারার মানুষ, প্রত্যেকের মুখে আমি অম্লান হাসি দেখেছি। সমস্ত ব্যবস্থাপনা খুব সুন্দর ছিল। সাক্ষাতের সময়ও দারুন শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ছিল। খলীফার সঙ্গে সাক্ষাত আমার পরম সৌভাগ্য ছিল। শুধু নিজের জামাতের মানুষের সঙ্গেই নয়, অন্যান্য ধর্ম ও জাতির মানুষের সঙ্গেও তাঁর সম্মান ও শ্রদ্ধার সম্পর্ক রয়েছে।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

দোয়ার জন্য হৃদয় যখন বেদনায় পূর্ণ হয়ে যায় এবং সকল আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলে, সেই সময় বুঝে যাওয়া উচিত যে দোয়া কবুল হয়েছে। এটি মহান নাম। **(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১০০)**

দোয়াপ্রার্থী: **Pervez Hossain Sb, Bolpur, Birbhum**

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

যতক্ষণ না প্রিয় থেকে প্রিয়তর বস্তুকে ব্যয় করবে, ততক্ষণ খোদার নৈকট্যভাজন হওয়ার মর্যদা লাভ হতে পারে না।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড , পৃ: ৬৪)

দোয়াপ্রার্থী: **Begum Aseya Khatun, Harhari (Murshidabad)**

ওয়াকফে নও ন্যাশনাল সেক্রেটারীদের জন্য প্রথম আন্তর্জাতিক রিফ্রেসার কোর্স এ হুযুরের ভাষণ

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পরহযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) বলেন:আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় 'ওয়াকফে নও ন্যাশনাল সেক্রেটারীদের জন্য প্রথম আন্তর্জাতিক রিফ্রেসার কোর্স' এই সপ্তাহান্তে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের পারস্পরিক অভিজ্ঞতা, এবং কেন্দ্রীয় টীম-এর পরিবেশনা থেকে লাভবান হয়ে থাকবেন, যেখানে তারা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে আমি ওয়াকফে নও বিভাগকে যেসকল নির্দেশনা দিয়েছি তার আলোকে আপনাদের জন্য দিকনির্দেশনা পেশ করে থাকবেন।

যাহোক, আজ আমি এই সুযোগে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, বিশেষত সেই প্রেরণা সম্পর্কে, যার সাথে আপনাদের নিজ নিজ দেশে ওয়াকফে নও সেক্রেটারী হিসেবে নিজ দায়িত্ব পালন করতে সচেষ্ট হওয়া উচিত। প্রথমতঃ আমি আপনাদেরকে ওয়াকফে নও স্কীমটির অসাধারণ গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে স্মরণ করাতে চাই। এটি সেই আশীষমণ্ডিত স্কীম যা আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছায় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) জামা'তের ভবিষ্যত সমৃদ্ধি এবং প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ স্কীমের উদ্দেশ্য ছিল যত বেশি সংখ্যায় সম্ভব ওয়াকেফীন বা উৎসর্গকারী প্রস্তুত করা যাদেরকে জন্মকাল থেকে এ উদ্দেশ্য নিয়ে বড় করা হয় যে, তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে জামা'তের চাহিদা পূরণ করবে যেমন- তবলীগ ও তরবিয়ত এবং এর পাশাপাশি শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে ওয়াকফে নও স্কীমের সূচনালগ্ন থেকে হাজার হাজার আহমদী পিতা-মাতা তাদের অনাগত সন্তানদেরকে ইসলামের উদ্দেশ্যে একান্ত নিষ্ঠার সাথে উৎসর্গ করেছেন। বিশেষ করে অগণিত আহমদী মায়েদের দ্বারা প্রদর্শিত কুরবানীর চেতনা একেবারেই অতুলনীয়।আপনাদের নিজ নিজ দেশের ন্যাশনাল সেক্রেটারী হিসেবে একটি গুরুভার দায়িত্ব আপনাদের ওপর অর্পিত হয়েছে যেখানে এখন আপনাদের দায়িত্ব সেই সকল শিশুদের নৈতিক, আধ্যাত্মিক এবং শিক্ষাগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যারা এ স্কীমের অধীনে জন্মলাভ করেছে।আপনাদেরকে অবশ্যই তাদের গড়ে ওঠার প্রতিটি পর্যায়ে তাদেরকে পথ প্রদর্শন করতে হবে, কেননা তারা সেসব সত্তা যারা মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মহান মিশনের পূর্ণতায় আগামী বছরগুলোতে কেন্দ্রীয় ও অপরিহার্য ভূমিকা রাখবেন। এটিই ওয়াকফে নও এর উদ্দেশ্য। ওয়াকফে নও স্কীম শুরু হওয়ার পর থেকে আমরা বেশ কয়েকটি নতুন দেশে জামেয়া চালু করেছি। এভাবে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষার প্রচার এবং জামা'তের সদস্যদের নৈতিক প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মুবাল্লিগ প্রশিক্ষণ লাভ করছেন, যাদের মধ্যে অনেকেই ওয়াকফে নও।নিশ্চিতভাবে যদি আমাদের জামা'তের হাতে সেই সামর্থ থাকত তবে আমরা শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য একটি প্রতিষ্ঠান এবং এর পাশাপাশি একটি মেডিকেল কলেজ বা প্রশিক্ষণ হাসপাতাল চালু করতাম; কিন্তু বর্তমান পর্যায়ে এমন প্রকল্প শুরু করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। যাহোক কেবলমাত্র আল্লাহ্র ফযলে আমরা যে জামেয়াগুলো প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছি তার মাধ্যমে অন্ততপক্ষে আমাদের অস্থায়ী মুবাল্লিগের চাহিদা একটি সীমা পর্যন্ত পূরণ হচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোতে আমাদের চাহিদা এখনও প্রবল। বিশেষকরে আমাদের এমন ওয়াকফে নও প্রয়োজন যারা চিকিৎসা-বিজ্ঞান এবং শিক্ষকতায় অগ্রসর হয়ে আমাদের জামা'তের হাসপাতাল ও স্কুলসমূহের চাহিদা পূরণ করবেন।

সুতরাং আপনারা প্রত্যেকের আপনাদের নিজ নিজ দেশে, ওয়াকেফীনে নওদের উৎসাহিত করা উচিত যেন তারা সেই ক্ষেত্রগুলো অনুসরণ করে, যেগুলো জামা'তের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযোগী। উপরন্তু, প্রতি পদে আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য চাওয়ার অসাধারণ গুরুত্ব আপনাদের প্রত্যেককে অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে। যদি তাঁর আশীষ ও অনুগ্রহ থেকে আপনারা বঞ্চিত হয়ে যান তবে আপনাদের সকল প্রচেষ্টা বৃথা যাবে। তাই অন্য সকল কিছুর পূর্বে, প্রত্যেক ওয়াকফে নও সেক্রেটারীর, তিনি স্থানীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় পর্যায়ের হোন না কেন, নিজ আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মানের ওপর দৃষ্টি দিতে হবে।তাদের সততার সাথে মূল্যায়ন করতে হবে- তারা নিজেরা সেই মানে উপনীত কিনা এবং তা সমুন্নত রাখছেন কিনা যা ওয়াকফে নও সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদানে তাদের দায়িত্ব পালনের জন্য আবশ্যক। যারা ওয়াকফে নও-দের নৈতিক উন্নয়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত, তারা নিজেদের আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতির জন্য সর্বদা চেষ্টারত কিনা? তারা কি আল্লাহ্ তা'লা এবং মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করছেন? তারা কি নিয়মিত নফল নামায আদায় করছেন? তারা কি পরিপূর্ণ বিনয়ের সাথে সিজদাবনত হয়ে তাদের দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালন করার জন্য আল্লাহ্র সাহায্য কামনা করছেন? যেভাবে আমি বলেছি, দোয়া ছাড়া কোন কিছুই অর্জন করা সম্ভব নয়। অপরপক্ষে, দোয়ার কল্যাণে যা অর্জন করা যায় তার কোনো সীমা-পরিসীমা নেই।

নিশ্চিতভাবে, আমাদের জামা'তের যেকোনো সফলতার মূল ভিত্তি হল, আন্তরিক দোয়া এবং আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত। সুতরাং, যদি আপনারা হৃদয় উজাড় করা দোয়াকে কঠোর পরিশ্রম এবং নিজ দায়িত্ব পূরণের আন্তরিক আকাঙ্খার সাথে জুড়ে দিতে পারেন তবে এর অসাধারণ ফলাফল প্রকাশ পাবে।এতে বিশাল সংখ্যায় ওয়াকেফীনে নও তাদের নৈতিক, আধ্যাত্মিক তথা শিক্ষাগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করবে এবং তারা সামনে অগ্রসর হয়ে জামা'তের জন্য অসাধারণ সেবা প্রদান করবে।

সুতরাং যদি আপনারা আকাঙ্ক্ষা করেন যে, ওয়াকফে নও-এর সদস্যগণ নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার চরম শিখরে আরোহণ করুক, তবে আপনাদের নিজেদের ওয়াকফে নও সেক্রেটারী হিসেবে খোদা তা'লার সাথে এক সুনিবিড় ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং সব সময় সর্বোচ্চ নৈতিক মান ও আচরণের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা আবশ্যক।

প্রত্যেক ওয়াকফে নও সেক্রেটারীকে, তিনি স্থানীয় বা জাতীয়, যে পর্যায়েরই হোন না কেন, অনুধাবন করতে হবে যে, তাকে এক বিশাল বিশ্বাসযোগ্যতার পদে নির্বাচিত করা হয়েছে। এই সকল নবীনদের, যাদের বাবা মা তাদের জীবনকে ইসলামের সেবার জন্য উৎসর্গ করেছেন, প্রশিক্ষন ও পথ দেখানোর জন্য জামা'তের অন্যান্য সদস্যবৃন্দ আপনাকে যথাযথ দক্ষতা ও নৈতিক চরিত্রের অধিকারী বলে মনে করেছেন।বিশেষতঃ জাতীয় পর্যায়ের ওয়াকফে নও সেক্রেটারীদের এ বিষয়টিকে বিশেষভাবে মূল্যায়ন করা উচিত যে, স্থানীয় জামা'তের সুপারিশক্রমে তাদের অনুমোদন সরাসরি খলীফাতুল মসীহ্ স্বয়ং প্রদান করেছেন। তাদের অনুধাবন করা উচিত যে, যুগ খলীফা তাদের অনুমোদন দান করেছেন এ আশা ও প্রত্যাশার সাথে যে, তারা বিনয় ও আত্মনিবেদনের সাথে সেবা প্রদান করবেন এবং সকল সময়ে সর্বোচ্চ নৈতিক মূল্যবোধ প্রদর্শন করবেন এবং নিজ দেশের ওয়াকফে নও-দের মধ্যে এমন মূল্যবোধসমূহ জাগরুক করার জন্য বিশ্বস্ততার সাথে সংগ্রাম করবেন।সুতরাং আপনাদের ওপর অর্পিত আস্থাপূর্ণ দায়িত্ব তখনই যথাযথভাবে পালিত হবে যখন আপনারা আপনাদের সত্তায় পূর্ণাঙ্গীনভাবে প্রকৃত ইসলামী মূল্যবোধসমূহ ধারণ করবেন।আপনাদের কাঁধে অর্পিত দায়িত্বকে কখনো অনাদর করবেন না বা অবহেলা করবেন না।বাহ্যিক প্রয়াসের ক্ষেত্রে, আপনাদেরকে এ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে যে, আপনারা যেন ওয়াকফে নও-দেরকে তাদের ধর্মীয় তরবিয়তের এবং তাদের প্রতিষ্ঠানিক পড়াশোনা ও পেশাবৃত্তি নির্বাচন উভয় দিক দিয়ে পথপ্রদর্শন করেন। সুতরাং আপনাদের এমন হৃদয়গ্রাহী কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে যেগুলো তাদের ক্রমবর্ধমান নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার উন্নয়নের দ্বার উন্মোচন করবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল, আপনাদেরকে অবশ্যই অল্প বয়স থেকেই ওয়াকেফীনদের শেখাতে হবে, তাদের ওয়াকফের দাবি কী এবং এর অর্থ কী? আপনাদেরকে অবশ্যই তাদের হৃদয়ে এ বিষয়টি গেঁথে দিতে হবে যে, 'ওয়াকফে নও' একটি উপাধি নয় বরং একটি দায়িত্ব এবং বাধ্যবাধকতা। এটি এক পবিত্র বন্ধন এবং এক মর্যাদাপূর্ণ অঙ্গীকার। এটি আজীবন পূরণীয় এক অঙ্গীকার ও আত্মত্যাগ যা ধর্মের খাতিরে করা হয়, যেখানে সকল জাগতিক বিষয়াদি এবং পার্থিব পদসমূহ ওয়াকফে নও-এর অঙ্গীকারকে পূরণ করার মোকাবিলায় কোন মূল্যই রাখে না। যদি আপনারা শৈশব থেকে শুধু এই মূল্যবোধগুলিই তাদের মধ্যে গেঁথে দিতে পারেন, তবেই ওয়াকফে নও সদস্যরা ওয়াকফ এবং তাদের পিতা-মাতার কৃত অঙ্গীকার, যা তারা প্রাপ্তবয়স্ক হলে নবায়ন করে, তার প্রকৃত মূল্য অনুধাবন করবে। তারা অনুধাবন করবে যে, ওয়াকফে নও স্কীমের সদস্য হিসেবে তারা প্রকৃতপক্ষে 'ওয়াকফে যিন্দেগী' আর সেই 'ওয়াকফ' বলতে এক বৃহত্তর উদ্দেশ্যে কারো নিজ সত্তার এক মহান 'আত্মোৎসর্গকে' বুঝায় আর এটি ছাড়া তাদের অঙ্গীকার অন্তঃসারশূন্য ও অর্থহীন সাব্যস্ত হবে।আমি আবারো বলছি যে, আপনাদের জন্য ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত স্থাপন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে আপনারা ওয়াকফে নও-দের ধর্মের খাতিরে সর্বপ্রকার ত্যাগস্বীকারের জন্য প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেন, সেখানে আপনাদেরকেও নিজ কথা অনুযায়ী ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করতে হবে।এভাবে আপনাদের সকলকে সম্মিলিতভাবে ধর্মের খাতিরে প্রকৃত কুরবানীতে রত থাকতে হবে।আপনাদের পেশাগত ও ব্যক্তিগত জীবনের পাশাপাশি নিয়মিতভাবে জামা'তের জন্য সময় কুরবানী করতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে, আপনাদের জাগতিক কাজকর্ম যেন কখনই ধর্মীয় দায়িত্বাবলীতে অবহেলার কারণ না হয়।আপনাদেরকে অবশ্যই নিয়মিত সময়মতো দৈনিক পাঁচবার নামায

আদায় করতে হবে।উপরন্তু আপনাদের রাত জেগে আল্লাহ্‌র সাহায্য কামনার্থে এবং নিজের দুর্বলতাসমূহের জন্য ক্ষমা চেয়ে তাহাজ্জুদ নামায পড়তে হবে। আপনাদেরকে অবশ্যই হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে সকল ওয়াকেফীনে নও-এর জন্য এবং এ আশীষমণ্ডিত স্কীমের নিরন্তর সফলতার জন্য দোয়া করতে হবে। আপনারা যদি এই প্রেরণা নিয়ে কাজ করেন তবেই ওয়াকফে নও সেক্রেটারী হওয়ার প্রকৃত উদ্দেশ্যসমূহ পূরণ করতে শুরু করবেন।এ প্রসঙ্গে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর নিম্নবর্ণিত গভীর তাৎপর্যপূর্ণ এবং মূল্যবান কথার দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করুন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন:

"এমনকি যখন কোন ব্যক্তি তার নিজ জাগতিক কাজে ব্যস্ত থাকে তখনও তার অবশ্যই খোদাভীরুতা বজায় রাখা উচিত এবং নিশ্চিত করা উচিত যে, ঈমান যেন সব সময় তার সকল বিষয়ের মধ্যে অগ্রাধিকার লাভ করে।" যদি আমাদের ওয়াকফে নও সেক্রেটারীগণ এবং কর্মকর্তাবৃন্দ এই মৌলিক বিষয়টি বুঝে যান তবে আমার কোন সন্দেহ নেই যে, বিশ্বের সকল প্রান্ত থেকে ওয়াকফে নও-দের এক অসাধারণ আধ্যাত্মিক সেনাদল উত্থিত হবে এবং জামা'তের সেবার জন্য প্রস্তুত হতে থাকবে।অগণিত সংখ্যায় ওয়াকেফীন দলে দলে অগ্রসর হয়ে মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মহান মিশনে অংশ নেওয়ার এক দৃঢ়প্রতিজ্ঞার সাথে নিজেদেরকে জামা'তের নিকট পেশ করতে থাকবেন। তারা নিজেদেরকে ইসলামের সেবার জন্য এবং বিশ্বজুড়ে খোদা তা'লার তৌহীদ বা একত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিবেদন করবেন।

ওয়াকফে নও সেক্রেটারী হিসেবে এটি নিশ্চিত করার জন্য আপনাদেরকে ওয়াকেফীনে নও-দের মাঝে তাদের ওয়াকফের প্রতি, জামা'তের প্রতি এবং নেযামে খিলাফতের প্রতি পূর্ণ বিশ্বস্ততার এক প্রেরণা বদ্ধমূলভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। উপরন্তু এই বিষয়টির গুরুত্ব অপরিসীম যে, ওয়াকফে নও শিশুরা যেন তাদের নিজেদের পারিবারিক পরিবেশে এবং জামা'তী পরিমণ্ডলে সর্বোচ্চ মানের নৈতিক আদর্শ এবং এমন বিশ্বস্ততার প্রদর্শন দেখতে পায়।

সুতরাং আপনাদেরকে ওয়াকফে নও শিশুদের পিতা-মাতাদেরও সর্বাবস্থায় জামা'তের সাথে বিশ্বস্ত ও সম্পৃক্ত এবং সর্বপরি আল্লাহ্ তা'লার নিকট আন্তরিকভাবে নিবেদিত থাকার বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করা উচিত। আবারও আল্লাহ্ তা'লার প্রতি নিবেদিত-প্রাণ হওয়ার বিষয়ে আপনাদের নিজেদের মানের বিষয়েও আপনাদের পর্যালোচনা করা উচিত এবং তার সাথে চিরন্তন নিজের বন্ধনকে আরো শক্তিশালী করে যাওয়া উচিত।যেভাবে আমি বলেছি, যদি আপনারা এ লক্ষ্যে সফল হন, তবে আমরা যুদ্ধ বা সংঘাতে অংশ নেওয়ার জন্য নয়, বরং বিশ্বে শান্তি, সৌহার্দ ও সহমর্মিতার উদ্দেশ্যকে অগ্রসর করার জন্য এক মর্যাদাপূর্ণ আধ্যাত্মিক বাহিনীর উত্থান হতে দেখবো।প্রকৃত ওয়াকফে নও-এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমার অক্টোবর ২০১৬ তে ক্যানাডায় প্রদত্ত জুমুআর খুতবাটি ওয়াকফে নও সেক্রেটারী হিসেবে আপনাদের পুনরায় শোনা উচিত। খুতবাটি 'দি এসেন্স অফ এ ওয়াকফে নও' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে এবং এখানে আপনাদেরকে প্রদানও করা হয়েছে, আর তাই আপনারা নিশ্চিত করুন যে, আপনারা এটি মনোযোগ সহকারে পাঠ করেন এবং সেই সকল স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী চিহ্নিত করুন যেগুলো একজন ওয়াকফে নও-কে অন্যদের থেকে পৃথক করবে এবং তাদেরকে বিশেষত্ব দান করবে। আর অবশ্যই, অন্যের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার পূর্বে, দেখে নিন যে, এই বিশেষত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যাবলী ধারণের দাবি আপনারা নিজেরা পূরণ করেন কিনা।

আলহামদুলিল্লাহ, ওয়াকেফীনে নও-দের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেভাবে আমি বলেছি, বিভিন্ন জামেয়ার মাধ্যমে, মুবাল্লিগদের এক বাহিনী প্রস্তুত হচ্ছে। তবে আমাদের কেবল মুবাল্লিগ-এর প্রয়োজন নয়। প্রতি বছর নতুন নতুন প্রকল্প ও পরিকল্পনাসমূহ জামা'ত কর্তৃক সূচিত হচ্ছে, যেগুলোর জন্য বিভিন্ন ধরনের পেশাগত দক্ষতা প্রয়োজন, আর তাই আপনাদেরকে ওয়াকফে নও-দের অনুধাবন করাতে হবে তারা যেন এমন প্রশিক্ষণ ও যোগ্যতা অর্জন করেন যা জামা'তের জন্য কাজে আসবে। এক্ষেত্রে যদি ওয়াকফে নও-এর অঙ্গীকারের গুরুত্ব এবং ওয়াকফে নও স্কীমের প্রকৃত মর্যাদা শৈশব থেকেই ওয়াকেফীনে নও-দের মানসপটে গেঁথে দেওয়া হয়, তবে তারা অনুধাবন করবেন যে, তারা যা কিছু প্রশিক্ষণ বা যোগ্যতা অর্জন করবেন তারা তাদের ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্যে নয় বরং জামা'তের কাজে আসার জন্য।তারা জামা'তের বহুবিধ চাহিদা পূরণের জন্য এগিয়ে আসবেন। আমাদের স্কুলসমূহের শিক্ষকের স্বল্পতা পূরণে তারা এগিয়ে আসবেন।আফ্রিকা, পাকিস্তান ও ভারতে আমাদের হাসপাতালগুলোতে ডাক্তারের ঘাটতি পূরণে তারা এগিয়ে আসবেন। উদাহরণস্বরূপ আমরা বর্তমানে ইন্দোনেশিয়ায় একটি হাসপাতালের প্রকল্প নিয়ে কাজ করছি, আর তাই আমাদের সেখানে সেবা প্রদানের জন্য আহমদী ডাক্তার এবং দক্ষ চিকিৎসাসেবী প্রয়োজন হবে।ভালো হয় যদি ডাক্তারগণ ইন্দোনেশিয়া অথবা নিকটবর্তী দেশসমূহ থেকে হন যেন সেখানে চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্য যে স্থানীয় মেডিকেল লাইসেন্স প্রয়োজন তা সহজে লাভ করা যায়।

অনুরূপভাবে যদি যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা বা ল্যাটিন আমেরিকা থেকে ওয়াকেফীনে নও চিকিৎসকগণ নিজেদেরকে সেবার জন্য উপস্থাপন করেন তবে তা গুয়াতেমালায় আমাদের হাসপাতালের বৃদ্ধি ও উন্নয়নে সহায়তা করবে। আফ্রিকা, ইউরোপ ও পাকিস্তান এবং বিশ্বের অন্যান্য অংশ থেকেও আমাদের ওয়াকফে নও ডাক্তার প্রয়োজন, যেন আমরা মানবতার সেবায় আমাদের প্রয়াসকে বৃদ্ধি করতে পারি।এ বিষয়ে আপনাদের প্রত্যেকের নিজ নিজ দেশ অনুসারে একটি বিস্তারিত কর্মসূচি প্রস্তুত করতে হবে।এটিও গুরুত্বপূর্ণ যে, জাতীয় ওয়াকফে নও সেক্রেটারীগণ স্থানীয় পর্যায়ের ওয়াকফে নও সেক্রেটারীগণের সাথে যেন স্থায়ীভাবে যুক্ত থাকেন। উদাহরণস্বরূপ, যুক্তরাষ্ট্র ও ক্যানাডা দুটোই বিশাল দেশ আর তাই আপনাদেরকে স্থানীয় জামা'তের ওয়াকফে নও সেক্রেটারীদের পথ-প্রদর্শন করতে হবে আর নিশ্চিত করতে হবে তারা যেন সব সময় সক্রিয় থাকেন।নিশ্চিত করুন তারা যেন তাদের দায়িত্বের মাত্রা এবং গুরুত্ব অনুধাবন করেন। নিজ এলাকার প্রত্যেক ওয়াকফে নও সদস্য যেন তাদের অঙ্গীকারের গুরুত্ব অনুধাবন করেন তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে প্রত্যেক স্থানীয় ওয়াকফে নও সেক্রেটারীকে আমাদের এ আধ্যাত্মিক বাহিনী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা পালন করতে হবে।

প্রকৃতপক্ষে, কোন পদাধিকারী বা সেক্রেটারী কেবল তখনই সফলকাম হতে পারেন যখন তিনি আল্লাহ্‌র ভয়কে নিজ হৃদয়ে ধারণ করে আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর সেই নির্দেশ নিজেরা অনুসরণ করেন যে, তাদের শপথ ও অঙ্গীকারসমূহ তাদেরকে অবশ্যই পূরণ করতে হবে।উপরন্তু এমন ওয়াকফে নও সদস্যগণ রয়েছেন যাদের এমন কতক ক্ষেত্রে আগ্রহ ও স্বভাবজাত যোগ্যতা রয়েছে যেগুলো এ মুহূর্তে জামা'তের প্রয়োজন নেই। তথাপি এটি অত্যাবশ্যক যে, আমরা তাদেরকে যেন অবহেলা না করি বা তাদের সেবার সুযোগকে বৃথা যেতে না দিই।সুতরাং ঐ সকল ওয়াকেফীনে নও যাদেরকে এই মুহূর্তে জামা'তের সেবার জন্য ডেকে নেওয়া হয় না, তারা আইনজীবী, গবেষক, প্রকৌশলী বা অন্য কিছু যাই হন না কেন, তাদেরকে অনুধাবন করতে হবে যে, সব সময় তাদের জীবনে ধর্মকে প্রাধান্য দিতে হবে। এমন হওয়া উচিত নয় যে, তারা তাদের পেশার ওপর মনোযোগী হয়ে যান আর এর ফলস্বরূপ তারা নিজেদের নফল নামায আদায়ের সময় তাদের না থাকে অথবা তারা প্রতিদিন পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত এবং এর ওপর মনোনিবেশ করতে ব্যর্থ হন।তাদের অবশ্যই এমন চিন্তার ফাঁদে পড়া উচিত হবে না যে, তাদের পেশার দাবির কারণে তাদের এখন আর নিজেদের ধর্মীয়জ্ঞান বৃদ্ধির বা জামা'তের দায়িত্বাবলী পালনের বা তবলীগের জন্য সময় দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

আল্লাহ্‌র ফযলে প্রফেসর ড. আব্দুস সালাম সাহেব বিজ্ঞানের ময়দানে সর্বোচ্চ শিখরে আরোহন করেছিলেন; কিন্তু এ সত্ত্বেও তিনি কখনো আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তাঁর দায়িত্ব ভুলে যান নি।তিনি সবসময় নিজের পাঁচ ওয়াক্তের নামায নিয়মিত আদায় করতেন এবং তাহাজ্জুদের জন্য ভোরে উঠে যেতেন। তিনি গভীর মনোনিবেশের সাথে পবিত্র কুরআন চর্চা করতেন আর সেখান থেকে বিভিন্ন প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়ে উপনীত হতেন যা তাঁকে তাঁর দৈনন্দিন জীবন এবং তাঁর কর্মের ময়দানে পথপ্রদর্শন করত। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর লেখনীর উপর তাঁর ভাল পড়াশোনা ছিল।

সুতরাং এমন কেউ যিনি বলেন যে, তার পেশাদারী ব্যস্ততার দরুন তার নিজ ধর্মীয় দায়িত্ব পালনের সময় নাই, তিনি কেবল তার নিজ অলসতা ঢাকার জন্য বাহানা তালাশ করে থাকেন।

ওয়াকফে নও সম্পর্কে আরেকটি নির্দেশনা যা আমি সম্প্রতি প্রদান করেছি, তা আমি এখানে পুনরাবৃত্তি করতে চাই।যেহেতু প্রত্যেক ওয়াকফে নও সদস্যকে পূর্ণকালীন সেবায় নিয়োজিত করা জামা'তের পক্ষে সম্ভব নয়, সেহেতু যে সকল সদস্যের যথাযথ শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং দক্ষতা রয়েছে তারা পাবলিক সার্ভিসে যোগদান করতে পারেন, যেমন-কিনা সিভিল সার্ভিসে যোগদানের মাধ্যমে।এমন ওয়াকেফীনকে আল্লাহ্‌র সাথে তাদের সম্পর্ক ক্রমাগতভাবে উন্নত করে যেতে হবে এবং নিজ ধর্মীয় দায়িত্বাবলী পালন করতে হবে আর একই সাথে তারা দেশ ও বৃহত্তর সমাজের সেবায়ও নিয়োজিত থাকবেন।আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এত দান করেছেন যে, কোন কোন দেশে ওয়াকফে নও-এর সংখ্যা এখন এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, জামা'তের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি আমরা দেশের চাহিদা পূরণের দিকে আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে পারি।

এভাবে আমাদের জামা'ত পৃথিবীতে এক মহান ইতিবাচক পরিবর্তন বয়ে আনতে পারে, ইনশাআল্লাহ্।

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 6 Thursday, 5 Aug, 2021 Issue No.31

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mob: +91 9915379255
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.575/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

বি:দ্র:– সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বিভিন্ন সময়ে নিজের চিঠিতে এবং এম.টি.এর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যে নির্দেশনা প্রদান করেছেন, সেগুলি থেকে পাঠকদের উদ্দেশ্যে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

প্রশ্ন: মহিলাদের বিশেষ দিনগুলিতে লিখিত কুরআন শরীফ হাতে নেওয়া এবং পড়ার বিষয়ে , এছাড়াও কম্পিউটার বা আইপ্যাড থেকে কুরআন করীমের তিলাওয়াত প্রসঙ্গে কে ব্যক্তি বিভিন্ন ফিকাহবিদ ও আলেমদের উদ্ধৃতি সম্বলিত একটি গবেষণাপত্র হুযুর আনোয়ারের সমীপে উপস্থাপন করে এ বিষয়ে হুযুরের দিক–নির্দেশনা জানতে চাওয়া হয়।

হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০১৮ সালের ৫ই অক্টোব তারিখে তাঁর লেখা চিঠিতে এর নিম্নরূপ উত্তর প্রদান করেছেন। তিনি বলেন–

এ বিষয়ে উলেমা এবং ফিকাহবিদদের মাঝে মতবিরোধ পাওয়া যায়। আর উম্মতের বুযুর্গরাও কুরআন সম্পর্কে নিজেদের বোধগম্যতা অনুযায়ী এ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন।

কুরআন করীম, হাদীস এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর উদ্ধৃতির আলোকে এ বিষয়ে আমার অবস্থান হল, ঋতুবতী মহিলারা কুরআনের সেই অংশ যিকর হিসেবে মনে মনে পড়তে পারে যেগুলি তাদের মুখস্ত আছে। এছাড়া প্রয়োজনে কোন পরিস্কার কাপড়ের সাহায্যে কুরআন করীম হাতেও নিতে পারে আর কাউকে কোন উদ্ধৃতি দেখিয়ে দেওয়ার জন্য বা শিশুদেরকে কুরআন করীম পড়ানোর জন্য কুরআন করীমের কোন অংশ পড়তেও পারে, কিন্তু যথারীতি তিলাওয়াত করতে পারে না।

অনুরূপভাবে এই দিনগুলিতে কম্পিউটারে বা আইপ্যাডে, যেখানে বাহ্যত কুরআন করীম হাতে নিতে হয় না, তিলাওয়াত করার অনুমতি নেই। তবে বিশেষ প্রয়োজনে যেমন, উদ্ধৃতি সন্ধানের জন্য বা কাউকে খুঁজে দেওয়ার জন্য কম্পিউটারে কুরআন ব্যবহার করা যেতে পারে, এক্ষেত্রে কোন অসুবিধে নেই।

প্রশ্ন: এক ভদ্রমহিলা বিশেষ দিনগুলিতে মহিলাদের মসজিদে আসার বিষয়ে বিভিন্ন হাদীস এবং বর্তমান যুগে মহিলাদের জন্য এই দিনগুলিতে নিজেদের পরিচ্ছন্নতার জন্য সাজ–সরঞ্জামের উপকরণের কথা উল্লেখ করা একটি প্রতিবেদন হুযুর আনোয়ারের সমীপে উপস্থাপন করেন এবং মসজিদে অনুষ্ঠিত জামাতী মিটিং এবং বৈঠকে এমন মহিলাদের অংশগ্রহণ এবং অমুসলিম মহিলাদের মসজিদ পরিদর্শনের বিষয়ে হুযুর আনোয়ারের নিকট দিক–নির্দেশনা চান।

২০১৪ সালের ১৪ই মে লেখা চিঠিতে হুযুর আনোয়ার বলেন–

ঋতুবতী মহিলাদের মসজিদ থেকে কোন জিনিস নিয়ে আসা বা নিয়ে যাওয়া এবং মসজিদে বসার বিষয়ে আঁ হযরত (সা.) ভিন্ন ভিন্ন নির্দেশ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। যেমনটি আপনি নিজের পত্রেও একথার উল্লেখ করেছেন যে, হুযুর (সা.) তাঁর স্ত্রীদেরকে উক্ত অবস্থায় মাদুর বা চাটাই পেতে দেওয়ার জন্য মসজিদে যাওয়ার অনুমতি দিতেন। কিন্তু যতদূর এই অবস্থা মসজিদে বসার সম্পর্ক, এ বিষয়ে হুযুর (সা.) এর স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা হাদীসে বর্ণিত আছে। হুযুর (সা.) উভয় ঈদের দিনে যুবতী, পর্দাশীল, ঋতুবতী= সব ধরণের মহিলাদেরকে ঈদের জন্য যাওয়ার তাগিদ করেছেন। এমনকি যে মহিলার কাছে ওড়না নেই তাকেও বলেছেন সে যেন তার কোন বোনের কাছ থেকে ওড়না ধার করে নিয়ে যায়। কিন্তু সেই সঙ্গে ঋতুবতী মহিলাদের জন্য এই নির্দেশও দিয়েছেন যে, তারা যেন নামাযের স্থান থেকে পৃথক দূরে সরে গিয়ে দোয়ায় অংশগ্রহণ করে।

অনুরূপভাবে বিদায় হজ্জের সময় যখন হজ্জের পূর্বে অন্যান্য মুসলমানেরা উমরা করছিল, হযরত আয়েশা (রা.) সেই সময় ঋতুবতী ছিলেন। সেই কারণে হুযুর (সা.) তাকে উমরা করার অনুমতি দেন নি। কেননা তোয়াফ করার জন্য মসজিদে বেশি সময় পর্যন্ত থাকতে হয়। এরপর যখন মাসিকের দিনগুলি অতিক্রান্ত হয়ে যায়, তখন হজ্জের পর তাঁকে আলাদা করে উমরার জন্য পাঠানো হয়।

কাজেই হাদীসে এতটা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করার পর আমাদের নিজেদের বাসনা চরিতার্থ করার জন্য নিত্য নতুন পথ সন্ধান করার কোন কারণ অবশিষ্ট থাকে না।

যতদূর এই বিষয়ের সম্পর্ক যে, অতীতে মহিলারা নিজেদের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য তেমন কোন উপকরণ হাতের কাছে পেত না,যেমনটি বর্তমান যুগের মেয়েরা পেয়ে থাকে। একথা সঠিক যে, এমন আধুনিক সাজসরঞ্জামের ব্যবস্থা ছিল না, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে তারা একেবারেই নিজেদের পরিচ্ছনতা বজায় রাখতে পারত না, তাদের ঋতুস্রাব এদিকে সেদিকে গড়িয়ে পড়ত। মানুষ প্রত্যেক যুগেই নিজের প্রয়োজনের জন্য উন্নত থেকে উন্নততর ব্যবস্থা অর্জন করার চেষ্টা করেছে। অতীতেও মহিলারা নিজেদের পরিচ্ছন্নতার জন্য সর্বোত্তম ব্যবস্থা করত।

এছাড়াও এই আধুনিক যুগের পরিচ্ছন্নতার প্রসাধনীতেও খামতি আছে। যাদের অত্যধিক ঋতুস্রাব হয়, অনেক সময় তাদের প্যাডে ছিদ্র হয়ে যাওয়ার কারণে কাপড় নোংরা হয়ে যায়।

কাজেই ইসলামের শিক্ষা চিরন্তন এবং প্রত্যেক যুগের জন্য সমান, প্রত্যেক যুগে সেইভাবেই পালিত হবে যেভাবে আঁ হযরত (সা.)–এর যুগে হত।

যদি কোন স্থানে বাধ্যবাধকতা থাকে, নামাযের ঘর ছাড়া অন্য কোন জায়গা না থাকে, তবে সেই ঘরের শেষের দিকে দরজার কাছে একটি জায়গা নির্ধারণ করা যেতে পারে, যেখানে নামায পড়া হয় না। এমন মহিলারা সেখানে বসতে বা মসজিদের পিছনের অংশে এমন মহিলাদের জন্য চেয়ার পেতে দিয়ে তাদের বসার ব্যবস্থা করা হোক। যাতে নামায পড়ার জায়গা নোংরা হওয়ার বিন্দুমাত্র সংশয় না থাকে।

যতদূর অ–মুসলিম মহিলাদের মসজিদ পরিদর্শনের বিষয়টি রয়েছে, এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে প্রথমত তাদেরকে মসজিদে বসানো হয় না, শুধু ঘুরে দেখানো হয়, যার সময়কাল প্রায় ততটাই হয়, যতটা সময় মসজিদ থেকে চাটাই নিয়ে আসতে বা পেতে দিতে ব্যয় হয়। কিন্তু যদি কোথাও তাদেরকে মসজিদে বসানোর প্রয়োজন হয়, তবে নীচে নামাযের সারিতে বসানোর পরিবর্তে মসজিদের শেষের দিকে রাখা চেয়ারগুলিতে বসাবেন।

প্রশ্ন: এক ভদ্রলোক জানতে চান যে, দারে কুতনীতে একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে, হুযুর (সা.) ঈদের নামাযের পর বললেন, আমি খুতবা দিব, যে শুনতে চায় বসে থাকুক, আর যে যেতে চায় চলে যাক। হাদীসটি কি সঠিক?

২০২০ সালের ২০ শে অক্টোবর লেখা চিঠিতে বলেন:

ঈদের খুতবা শোনা থেকে অব্যহতি পাওয়ার বিষয়ে যে হাদীসটিকে আপনি দারে কুতনী থেকে উদ্ধৃত করেছেন, সেটি সুনানে আবু দাউদেও বর্ণিত হয়েছে।

একথা সঠিক যে হুযুর (সা.) ঈদের খুতবা শোনার বিষয়ে ততটা জোর দেন নি, যতটা জোর তিনি দিয়েছেন জুমআর খুতবায় অংশগ্রহণে এবং তা সম্পূর্ণ নীরবতা সহকারে শোনার বিষয়ে। এরই ভিত্তিতে উলেমা এবং ফিকাহবিদরা ঈদের খুতবাকে সুন্নত এবং পছন্দনীয় আখ্যায়িত করেছেন।

কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও স্মরণ রাখতে হবে যে, হুযুর (সা.) ঈদের জন্য যাওয়া এবং মুসলমানদের দোয়ায় অংশগ্রহণকে পুণ্যকর্ম এবং আশিস লাভের কারণ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। আর তিনি এ বিষয়ের প্রতি এতটাই জোর দিয়েছেন যে, যে মহিলার কাছে ওড়না নেই, সেও যেন কোন বোনের কাছ থেকে ওড়না চেয়ে নিয়ে ঈদের জন্য যায়। আর ঋতুবতী মহিলাদেরকেও ঈদে যাওয়ার জোরালো নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, তারা যেন নামাযের জায়গা থেকে সরে দাঁড়িয়ে দোয়ায় অংশগ্রহণ করে।

প্রশ্ন: এক ভদ্রমহিলা রমযানের এতেকাফ সম্পর্কে জানতে চান যে, এতেকাফ কি বাড়িতে করা যায় আর এটি কি তিন দিনের জন্য হতে পারে?

হুযুর আনোয়ার (আই.) ২০১৫ সালের ৯ই আগস্ট তারিখের লেখা চিঠিতে বলেন–যতদূর রমযানের মসনুন এতেকাফের প্রশ্ন, যেমনটি কুরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণ হয় যে, বাড়িতে এবং তিন দিনের জন্য এতেকাফ হতে পারে না।

আঁ হযরত (সা.)–এর রীতি থেকে প্রমাণ হয় যে, তিনি রমযান মাসে কম করে দশ দিন মসজিদে এতেকাফ করতেন।হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ۔

অর্থাৎ– হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, রসুলুল্লাহ্ (সা.) আজীবন রমযানের শেষ দশ দিন এতেকাফ করতেন।

অনুরূপভাবে কুরআন করীমেও আল্লাহ্ তা'লা এতেকাফের বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন। (ক্রমশ....)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir